সীরাত
হযরত আম্মাজান

(হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী
হযরত সৈয়্যদা নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবার জীবন চরিত)

সাহেবযাদী আমাতুশ্ শাকুর

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সীরাত
হযরত আম্মাজান

সাহেবযাদী আমাতুশ্ শাকুর

ভাষান্তর : মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন
মুরব্বী সিলসিলাহ

গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.
প্রকাশক	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	**মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন** মুরব্বী সিলসিলাহ
বাংলা প্রথম প্রকাশ	জুন, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ
বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণ	জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণ	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Seerat Hazrat Amman Jan

সীরাত হযরত আম্মাজান

By **Sahibzadi Amatus Shakur**

Translated into Bengaly by
Maulana Shah Mohammad Nurul Amin

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978 984 991-326-9

উৎসর্গ

জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)
ও
সৈয়্যদা মনসুরা বেগম সাহেবার নামে

“আমাদের হযরত আম্মাজানের কোন প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই। খোদা যাঁর প্রশংসা করেছেন তাঁর আর কিইবা প্রয়োজন? কিন্তু আমাদের উপরও এ দায়িত্ব বর্তায়, সারাজীবন আমরা যা দেখেছি তা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্ণনা করে যাই।”

– হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'টি কথা

"সীরাতে হযরত আম্মাজান" পুস্তকটি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবার জীবন বৃত্তান্ত। এ পুস্তকে অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর স্ত্রী হবার কারণে জামাতের সদস্যরা তাঁকে "আম্মাজান" বলে সম্বোধন করতেন। আম্মাজানের গর্ভেই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জন্ম হয়েছে। জামাতের শেষ চারজন খলীফাও তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন।

হযরত আম্মাজানের জীবন ছিল অতুলনীয়। যারা কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন তারা তাঁর অভাবনীয় চারিত্রিক গুণাবলীতে অভিভূত হয়েছেন। উর্দূ ভাষায় তাঁর জীবনী সম্পর্কে অনেকগুলো বই লেখা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ কোন বই নেই। ফলে আমরা যারা উর্দূ বুঝি না, আম্মাজানের জীবন সম্পর্কে তাদের জানার তেমন একটা সুযোগ নেই। আমরা আশাকরি এ পুস্তক সংক্ষিপ্ত হলেও এর অনুবাদ তাঁর জীবনী জানতে আমাদের সহায়তা করবে। তাছাড়া পুস্তকটি আমাদের শিশু, কিশোর ও মহিলাদের তালীম তরবিয়তের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা **শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ**। মূল উর্দূর সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন মোহতরম মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোহতরম আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান সাহেব ও মোহতরম মাহবুব হোসেন সেক্রেটারী ইশায়াত, বাংলাদেশ। বর্তমানে বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে যেখানে পরিমার্জন ও কিছু তথ্যগত নতুন সংযোজন হয়েছে। অনুবাদক ও মাওলানা মানুন-উররশীদ মুরব্বী সিলসিলাহ এ কাজ করেছেন। এছাড়া যাঁরা যেভাবে এ পুস্তকের প্রকাশনার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'লা তাঁদের প্রত্যেককে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন॥

তারিখ : জুন ৩০, ২০১৬ খ্রি.

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

২৬ মে ১৯০৮ সাল । জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সৈয়্যদেনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মৃত্যুবরণের মুহূর্তটি জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদের জন্য ও তাঁর (আ.) বংশধরদের জন্য অত্যন্ত শোকাবহ ও বেদনাভারাক্রান্ত সময় ছিল। কিন্তু ঐ মুহূর্তে জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী হযরত সৈয়্যদেনা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা তাঁর সন্তানদের নিয়ে ঐ কক্ষে গেলেন- যেখানে হুযূরের (আ.) পবিত্র লাশ মুবারক রাখা ছিল, আর বললেন–

"সোনামণিরা! ঘর খালি দেখে এটা মনে করো না তোমাদের
পিতা তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি। তিনি উর্ধ্বলোকে
তোমাদের জন্য দোয়ার এক বিশাল ধন-ভান্ডার রেখে
গেছেন, তোমরা প্রয়োজনের সময় তা পেতে থাকবে।"

হযরত আম্মাজানের এ বাক্যাবলী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর শোককেই শুধুমাত্র হালকা করে নি বরং এ বাক্যাবলী তাঁর (আম্মাজানের) জীবনীরও একটি অংশ হয়ে গেছে। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় খোদা তা'লার প্রতি তাঁর কেমন বিশ্বাস ছিল। এ বিশ্বাসকে তিনি নিজের সন্তানদের মাঝে প্রতিফলিত করে তরবিয়তের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

এ বইয়ের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি কুদরতে সানিয়ার (দ্বিতীয় কুদরত) তৃতীয় প্রকাশস্থল হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ও হযরত সৈয়্যদা মনসুরা বেগম সাহেবা পড়েছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁদের দু'জনের পদমর্যাদাকে উন্নীত করুন।

এ মহান মহীয়সী নারীর (হযরত আম্মাজান) সাথে আহমদী শিশু কিশোরদের পরিচয় করানো ও তাদের পবিত্র জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখানোর জন্য এ বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ বইটি সংকলনের জন্য আমি সাহেবযাদী আমাতুশ শাকুর সাহেবার আন্তরিক শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করছি। আল্লাহ তা'লা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

মাহমুদ আহমদ
সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
আন্তর্জাতিক কেন্দ্র রাবওয়া।

নোট : এ পুস্তকটি নাযের নুশরা ও ইশায়াত কাদিয়ান-এর অনুমতি নিয়ে লাজনা ও নাসেরাতদের তরবিয়তের জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত প্রকাশ করেছে।

– সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত, কাদিয়ান।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
*	হযরত আম্মাজানের বংশ পরিচয়	৯
*	আম্মাজানের পিতামাতা	৯
*	হযরত আম্মাজানের জন্ম ও শৈশব	১১
*	হযরত আম্মাজানের বিয়ে	১১
*	হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে হযরত আম্মাজানের ধৈর্যধারণ	১৮
*	সতীন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আম্মাজানের ব্যবহার	২২
*	খোদার দৃষ্টিতে হযরত আম্মাজানের পদমর্যাদা	২৩
*	হযরত আম্মাজানের সন্তানাদি	২৪
*	হযরত আম্মাজানের স্বভাব-চরিত্র	৩১
*	কুদরতে সানীয়ার (খেলাফতের) সাথে গভীর সম্পর্ক	৩৭
*	হযরত আম্মাজানের আর্থিক কুরবানি	৩৮
*	সন্তানদের তরবিয়ত	৪০
*	সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা	৪৩
*	প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা	৪৪
*	এতীমদের প্রতি খেয়াল	৪৬
*	সেবকদের সাথে উত্তম ব্যবহার	৪৭
*	অভাবীদের সাহায্য	৪৭
*	নিজের কাজ নিজ হাতে করা	৪৮
*	স্বনির্ভরতা ও আত্মত্যাগ	৪৮
*	শির্কের প্রতি ঘৃণা	৪৯
*	হযরত আম্মাজানের আতিথেয়তা	৪৯
*	প্রফুল্লচিত্ততা	৫০
*	জ্ঞানের মূল্যায়ন ও সাহিত্যিক রুচিবোধ	৫১
*	হযরত আম্মাজানের হাতে লেখা চিঠি	৫২
*	সাহিত্যের রসবোধ	৫৪
*	নেকী অর্জনের আগ্রহ	৫৫
*	সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন	৫৫
*	জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন	৫৬
*	উদারতা প্রদর্শন	৫৬
*	পরনিন্দা ও পরচর্চার প্রতি ঘৃণা	৫৭
*	দোয়ার কবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা)	৫৮
*	হযরত আম্মাজানের মৃত্যু	৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আম্মাজানের বংশ পরিচয়

প্রিয় সোনামণিরা! ভারতের দিল্লী শহরে বুখারার অভিবাসী এক পুণ্যবান ব্যক্তি বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নাম খাজা মুহাম্মদ তাহের (রহ.)। এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব (রহ.) ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত খাজা (রহ.) সাহেবকে সম্রাট নিজের পীর মানতেন এবং তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ফলে এই সৈয়্যদ বংশকে তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের কারণে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। অনেক (পুণ্যবান) বুযুর্গের জন্ম হয়েছিল। বার'শ হিজরীতে হযরত খাজা মুহাম্মদ নাসের দেহলভী এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ঐ শতাব্দীর 'ওলী'* বলা হতো। তাঁর ছেলে হযরত খাজা মীর দারদ (রহ.)-কে-ও লোকেরা তের শতাব্দীর ওলী বলতো। হযরত খাজা মীর দার্‌দ (রহ.)-এর বংশে হযরত সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবার জন্ম হয়, যাঁকে আমরা **'হযরত আম্মাজান'** বলে ডাকি। তোমরা অবশ্যই হযরত আম্মাজানের নাম শুনেছ, আর তোমাদের মাঝে হযরত আম্মাজানের জীবনী সম্পর্কে কিছু জানারও আগ্রহ রয়েছে। তাই আমরা চিন্তা করেছি তোমাদের এ আগ্রহ নিবারণের জন্য এ মহীয়সী ও সম্মানিত আধ্যাত্মিক মায়ের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তোমাদের শুনাবো।

** ওলী অর্থ বন্ধু। আল্লাহ তা'লার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা স্থাপনকারীদের আল্লাহ্‌র ওলী বলা হয়।*

হযরত আম্মাজানের পিতামাতা

হযরত আম্মাজানের পিতা হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব, আর তাঁর মা হযরত সাইয়্যিদ বেগম সাহেবা। তারা উভয়েই অত্যন্ত পুণ্যবান ও সহজ সরল মানুষ ছিলেন। লোকেরাও তাঁদের খুবই সম্মান করতো। তাঁরা খুবই ধার্মিক ছিলেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে খুবই ভালোবাসতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নামায পড়তেন। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার [হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর] দাবির সাথে সাথে তাঁরা দু'জনেই বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন। হযরত আম্মাজানের পিতামাতা হবার কারণে সবাই তাঁদের **'নানাজান'** ও **'নানীজান'** বলে সম্বোধন করতো। হযরত নানাজান হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অত্যন্ত একনিষ্ট এবং

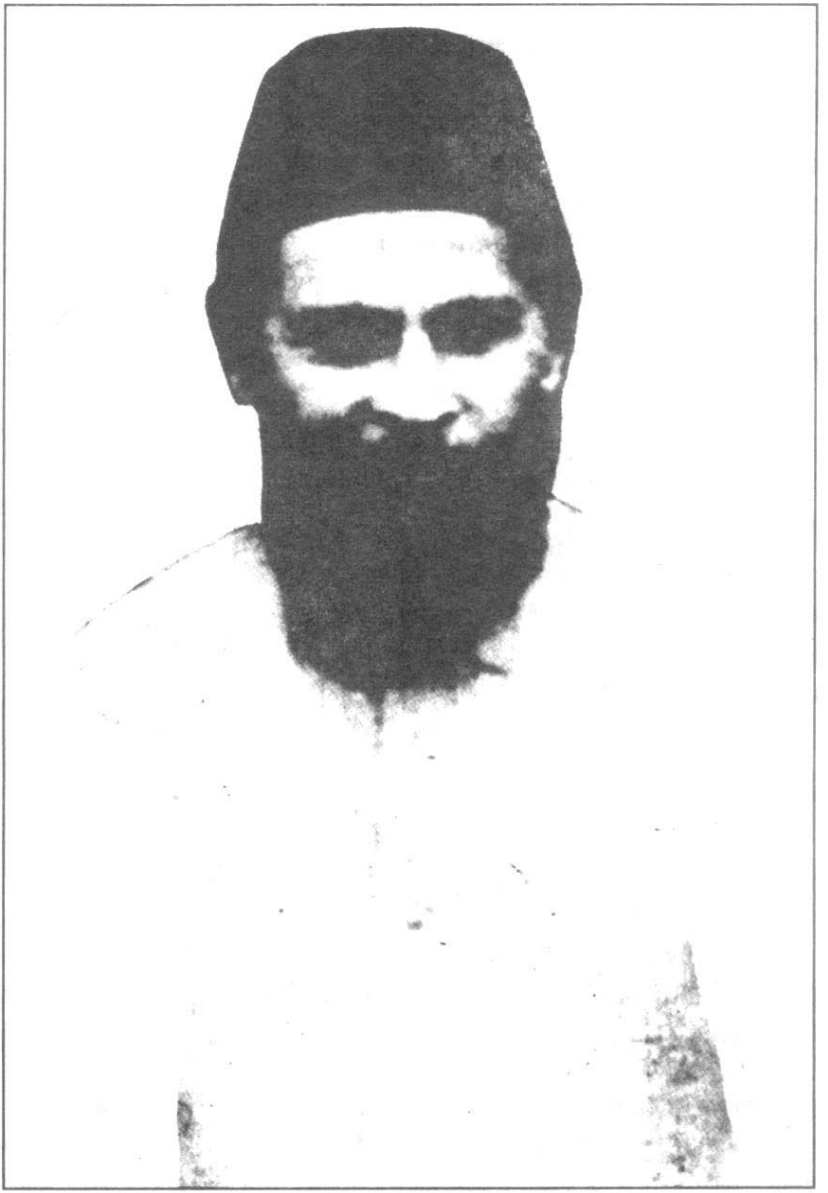

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)

হযরত আম্মাজানের পিতা

আহদীয়া জামাতের প্রথম সারির একজন সেবক ছিলেন। তিনি পেশার দিক থেকে একজন অভারশিয়ার (overseer) ছিলেন। কাদিয়ানে জামাতের সব অট্টালিকা তিনি বানিয়েছেন। এগুলো দেখেই ধর্মের সেবায় তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা কেমন ছিল তা সহজে অনুমান করা যায়। হযরত নানাজান যেমন এক অভিজাত সৈয়্যদ বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তেমনি হযরত নানীজানের বংশও অত্যন্ত অভিজাত ও সৈয়্যদ ছিল। তাঁর (আম্মাজানের) নানী ও দাদীর বংশও সৈয়্যদ ছিল। হযরত আম্মাজান পিতামাতার একমাত্র কন্যা সন্তান ছিলেন। এছাড়াও তাঁদের (নানা ও নানীজানের) দু'জন পুত্রসন্তান ছিলো। বড় সন্তান হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব ও ছোট ছেলে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব। হযরত আম্মাজানকে তাঁরা উভয়ে খুবই ভালোবাসতেন। আর খোদা তা'লার ফযলে দু'জনই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ও ধর্মের সেবক ছিলেন।

হযরত আম্মাজানের জন্ম ও শৈশব

হযরত আম্মাজান ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পূর্বে হযরত নানাজানের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এ সময়টাতে তিনি বেকার ছিলেন। কিন্তু আম্মাজানের জন্মের পর আল্লাহ তা'লার এমন আশীস বর্ষিত হলো, তাঁদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। হারানো সম্পত্তির একটা অংশ ফেরত পেলেন ও অপর দিকে একটা চাকুরীও পেয়ে গেলেন। ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেল। আল্লাহ তা'লা আম্মাজানের জন্মলগ্নেই যেন জানিয়ে দিলেন, তিনি একজন বরকতমন্ডিত সন্তান। হযরত নানাজান গৃহেই তাঁকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। কুরআন করীম শিখানো ছাড়াও উর্দূ লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনি শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে হয়েছিল। তিনি দিল্লীতে বড় হয়েছেন একারণে তাঁর উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ অর্থাৎ সব কিছুই দিল্লীবাসীদের মত ছিল। হযরত নানাজান তাঁর প্রথম নাম **নুসরাত জাহাঁ বেগম** এবং দ্বিতীয় নাম **আয়েশা** রাখেন।

হযরত আম্মাজানের বিয়ে

সে যুগে মেয়েদের অত্যন্ত অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হতো। অনেক জায়গা থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। কিন্তু তাঁর পিতামাতার কোন প্রস্তাব পছন্দ হয় নি। কোন প্রস্তাব হয় নানাজান পছন্দ করতেন না আবার কোন প্রস্তাব নানীজান ফিরিয়ে দিতেন।

মূলত: নানাজান একজন খুবই ধার্মিক পাত্র খুঁজছিলেন। যখন আম্মাজানের বয়স ১৮ (আঠার) হলো তখন হযরত নানাজান উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে লিখেন, "হুযূর দোয়া করবেন, আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে ধার্মিক ও পুণ্যবান জামাতা দান করেন।"

এদিকে হুযূর (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে জানালেন–

"مَیں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری دوسری شادی کر دوں اور سب انتظام
مَیں خود کروں گا۔"

"আমি সংকল্পবদ্ধ, তোমাকে দ্বিতীয় বিয়ে করাবো, আর সব ব্যবস্থা আমি নিজে করবো"।

ইলহামে এ-ও জানানো হয়েছিল–

"تیرا رشتہ دہلی کے ایک سید خاندان میں ہوگا۔"

"তোমার আত্মীয়তা দিল্লীর এক সৈয়্যদ বংশে হবে।"
এ কারণে নানাজানের দোয়ার চিঠি পাওয়ার পর হুযূর (আ.) আল্লাহ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী নিজের জন্য প্রস্তাব পাঠান। আর সাথে এটাও লিখে দেন, "আপনি আমার প্রতি সু-ধারণা (অর্থাৎ আস্থা) রেখে আমার সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন।"

এ সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রথম স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। সেই পক্ষে হুযূর (আ.)-এর দুই ছেলে ছিলেন। বড় ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ আর ছোট ছেলে মির্যা ফযল আহমদ। কিন্তু তাঁর (আ.) প্রথম স্ত্রীর মধ্যে পার্থিবতার আকর্ষণ বেশি ছিল আর ধার্মিকতা কম ছিল। এ কারণে দু'জনের মাঝে নামমাত্র সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল। হুযূর (আ.)-ও খুবই কষ্টের জীবন-যাপন করছিলেন। এ কারণে আল্লাহ চাচ্ছিলেন তিনি যেন দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

যখন বিয়ের প্রস্তাব এলো তখন হযরত নানীজান আপত্তি করলেন– তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী, তাদের রীতিনীতি ও ভাষা দিল্লীর চেয়ে ভিন্ন, বয়সও বেশি, পূর্বে বিয়েও করেছেন। ইতিমধ্যে হযরত আম্মাজানের আরো অনেক প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু নানীজানের এ প্রস্তাবগুলো পছন্দ হয় নি। তাই অবশেষে একদিন তিনি বললেন, "এ লোকগুলোর চেয়ে তো গোলাম আহমদ হাজার গুণে ভালো।"

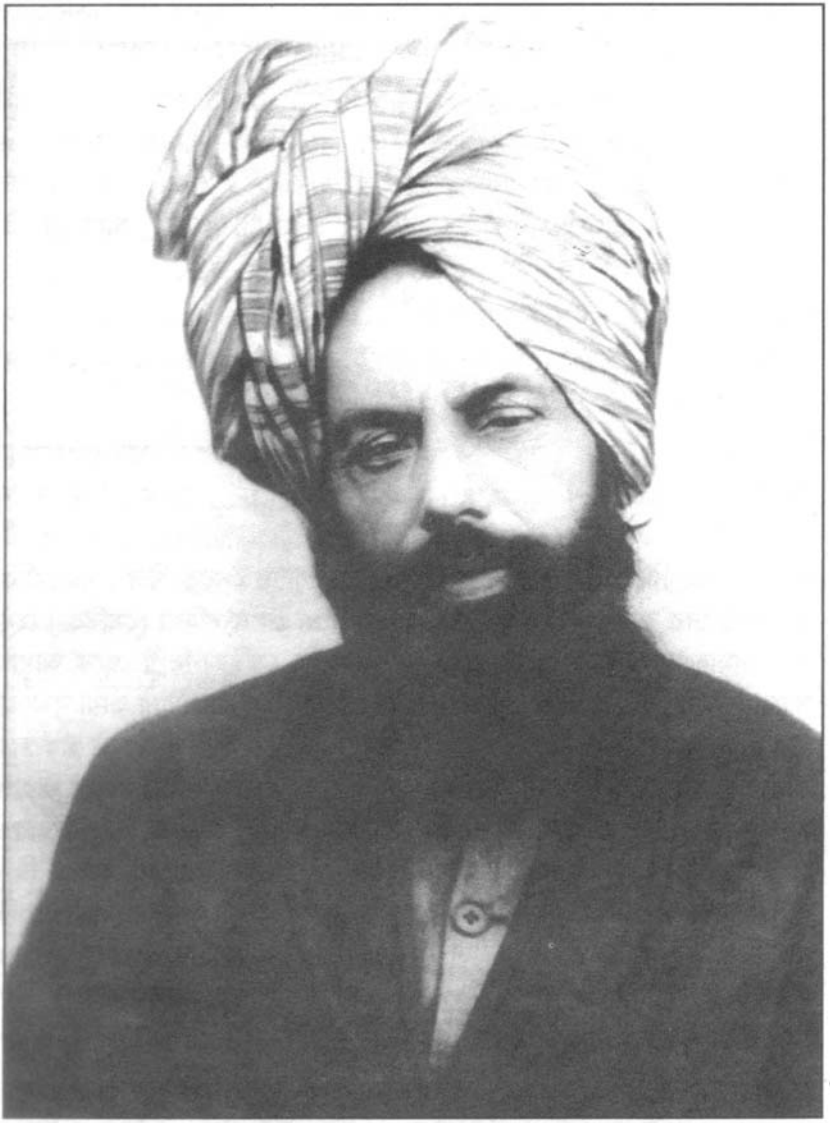

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)

হযরত নানাজান পূর্ব থেকে এটাই চাচ্ছিলেন। তাই যথাসময়ে এর সমর্থন পেয়ে হুযূর (আ.)-এর কাছে প্রস্তাব গৃহীত হবার খবর পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর হুযূর হযরত আম্মাজানকে বিয়ে করে দিল্লী থেকে কাদিয়ান নিয়ে যান। তাঁর বিয়ে দিল্লী জামে মসজিদের প্রখ্যাত খতীব সৈয়্যদ নাজির হোসেন দেহলভী পড়ান।

সংস্কৃতি ও ভাষার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও হযরত আম্মাজান নিজেকে এ পরিবেশে উত্তমভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। এ থেকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও অসাধারণ গুণাবলীর যে পরিচয় মিলে তা সাধারণ নারীর মাঝে দুর্লভ। শুরুতে তিনি খুবই ভয় পেয়েছিলেন, এমনকি নানীজানকে লিখে পাঠালেন, "আমি খুবই ভয় পাচ্ছি হয়তো চিন্তা আর অস্থিরতায় মরেই যাবো।"

কিন্তু এক মাস পর যখন দিল্লী গেলেন তখন তিনি নিজেই হযরত নানীজানকে বললেন, "তিনি আমাকে বড় আরামেই রেখেছেন। আমি এমনিতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

প্রথম প্রথম ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। এ সম্পর্কে হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা বলেন, আম্মাজান একবার বর্ণনা করেছেন- "তোমার পিতা যখন আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন তখন পরিবার-পরিজনরা খুবই বিরোধী ছিল (হয়তো বিয়ের কারণে)। ঘরে দু'চার জন পুরুষ সেবক ছিল। গৃহবাসীরা ঐ বেচারাদের রুটিও বন্ধ করে দিল। ঘরের মধ্যে কোন মহিলা সেবিকা ছিল না। আমার সাথে শুধুমাত্র ফাতেমা বেগম ছিল (এ সেবিকা দিল্লী থেকে আমার সাথে এসেছিল)। সে কারো ভাষা বুঝতো না, আর অন্যরাও তার ভাষা বুঝতো না। যখন আমরা পৌঁছি তখন সন্ধ্যা কিংবা রাত ছিল। একাকীত্ব ও ভিন্ন অঞ্চলের কারণে আমার হৃদয়ের অবস্থা অদ্ভুত ছিল। কাঁদতে কাঁদতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সান্ত্বনা দেবার অথবা দেখাশুনা ও খোঁজ-খবর নেবারও কেউ ছিল না। এমনকি খাইয়ে দেবার জন্য নিজের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। একাকীত্ব ও পেরেশানীর মধ্যে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল। কামরার মধ্যে একটা খাট ছিল যার পায়ের দিকে একটা কাপড় রাখা ছিল। এটার উপর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুয়ে থেকেই সকাল হয়ে গেল। পরবর্তী সকালে হুযূর (আ.) এক সেবিকাকে বলে ঘরে আরামের সব জিনিসের ব্যবস্থা করে দেন।"

সোনামণিরা! আল্লাহ তা'লা হযরত আম্মাজানকে মহান সম্মান দান করেছিলেন। তা হলো আল্লাহ তা'লা হযরত আম্মাজানের বংশের এক বুযুর্গকে এ বিয়ের ব্যাপারে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন (যে ব্যাপারে তোমরা পূর্বে পড়েছ)। অন্যদিকে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-কে-ও এ বিয়ের ব্যাপারে ইলহাম করেছেন। এ কারণে এ বিয়ে খোদার প্রত্যক্ষ ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে।

হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.)

হযরত আম্মাজানের বড় ভাই

হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)

হযরত আম্মাজানের ছোট ভাই

আর দ্বিতীয়ত তাঁর উত্তম গুণাবলীর কারণে জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন, খুবই সম্মান করতেন, খুবই মর্যাদা দিতেন আর তাঁকে নিজের জন্য এক মোবারক সত্তা মনে করতেন। হযরত আম্মাজানও এ বিষয়টি অনুভব করতেন। আর প্রায়ই অত্যন্ত আহ্লাদ ও গর্বের সাথে বলতেন, "আমার আসার সাথে সাথে আপনার জীবনে অধিকহারে বরকত আসার যুগের সূচনা হয়েছে।" এতে হুযূর (আ.) মুচকি হেসে জবাব দিতেন! "হ্যাঁ এটা সঠিক"।

হযরত আম্মাজান হুযূর (আ.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মনে হতো দু'টি বুকে যেন একটি হৃৎপিণ্ড কম্পিত হচ্ছে। যেভাবে সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়, সেভাবে তাদের মাঝে কখনো ঝগড়া হতো না। হুযূর (আ.) হযরত আম্মাজানের সাথে ভালোবাসা ও নরম সুরে কথা বলতেন। ঘরের কাজকর্মে কখনো এদিক সেদিক হয়ে গেলেও তিনি কিছু বলতেন না। একটি ঘটনা হযরত আম্মাজান শুনিয়েছেন, "আমি যখন প্রথম দিল্লী থেকে এলাম তখন আমার মনে হলো হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ক্ষীর খুব পছন্দ করেন। আমি খুবই আগ্রহের সাথে তা রান্না করার ব্যবস্থা করি। অল্প চাউল নিয়ে তাতে চারগুণ গুড় ঢেলে দেই। এটা সম্পূর্ণরূপে চিটাগুড়ের মত হয়ে গেল। যখন চুলা থেকে হাড়ি নামিয়ে প্লেটে ঢালি তখন এটা দেখে আমার খুব আক্ষেপ ও অনুতাপ হলো, হায়! এটা নষ্ট হয়ে গেছে! অন্যদিকে খাবারেরও সময় হয়ে গেছে। তাই আমি বিচলিত হয়ে গেলাম, এখন কী করব! এ সময় হুযূর [মসীহ মাওউদ (আ.)] এসে গেলেন। আমার চেহারায় আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণে কান্না-কান্না ভাব ছিল তা দেখে হুযূর [মসীহ মাওউদ (আ.)] হেসে বললেন, "ক্ষীর ভালো রান্না না হবার জন্য কি আফসোস হচ্ছে?" আবার বললেন, "না, এটাতো খুব মজাদার ও আমার পছন্দ মতই হয়েছে। এমন বেশি গুড়েরই আমার পছন্দ। এটা খুব ভালো হয়েছে।" এরপর খুব তৃপ্তিসহকারে খেলেন। হযরত আম্মাজান বলেন, "হুযূর [মসীহ মাওউদ (আ.)] আমাকে খুশি করার জন্য অনেক কথা বললেন, এতে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে গেল।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত আম্মাজানকে আল্লাহ তা'লার নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি মনে করতেন। আর তিনি যে কাজটি করার জন্য বলতেন মসীহ মাওউদ (আ.) খুব চেষ্টা করতেন যেন সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আর তিনি [হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)] এটাও বলতেন, "স্ত্রীদের অনেক বেশি খেয়াল রাখা দরকার।"

হযরত আম্মাজান হুযূরের [মসীহ মাওউদ (আ.)] একটি ঘটনা শুনান। 'দারুল মসীহর' ঐ অংশ যাতে হুযূর (আ.) থাকতেন তাতে একটা খোলা জায়গা ছিল। দক্ষিণ দিকের মহল্লার খালি গলির দিকে এর একটি জানালা ছিল। গরমের রাতে হুযূর (আ.) ও বাড়ির লোকেরা ঐ খোলা জায়গায় ঘুমাতেন। কিন্তু বৃষ্টির মৌসুমের ভোগান্তি ছিল কেননা বৃষ্টি হলে সব খাট ঘরে তুলে নিতে হতো। এ ব্যাপারে হযরত আম্মাজান পরামর্শ দেন, এ খোলা জায়গার এক অংশে ছাদ দেয়া হোক অর্থাৎ এর বারান্দা এমনভাবে বানানো হবে যাতে বৃষ্টির সময় খাটগুলো এর ভিতরে রাখা যায়। হুযূর (আ.) আদেশ দিলেন এভাবেই করা হবে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ও আরো কয়েকজন আপত্তি করলেন এমনটি করবেন না। এতে এ জায়গার আকৃতি নষ্ট হবে, এর সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি (আ.) সব কথা শুনে বললেন, তোমাদের কথাও ঠিক আছে, তবে আমার স্ত্রী খোদার নিদর্শনের মধ্যে একটি। আর সে আমার ঐ পুত্রের মা যার সম্পর্কে আমাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ কারণে আমি তার সব কথা মেনে নেই। তাই বারান্দা বানাতে চাই।

হযরত আম্মাজান নিজের এক ঘটনা প্রায়ই শুনাতেন। তিনি যখন প্রথম কাদিয়ানে আসেন, তখন তাঁর আলোতে ঘুমানোর অভ্যাস ছিল। যখন তিনি ঘুমিয়ে যেতেন হুযূর আলো নিভিয়ে দিতেন। আবার যখন তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেত তখন অন্ধকার দেখে তিনি ভয় পেয়ে যেতেন। হুযূর (আ.) আবার আলো জ্বালিয়ে দিতেন। পরে হুযূর (আ.)-এর আলোতে ঘুমানোর অভ্যাস হয়ে যায়। অবশেষে অবস্থা এমনই হলো ঘরের প্রত্যেক কোণায় হোক তা সিঁড়ি, গোসলখানা, কামরা কিংবা আঙ্গিনার কোন জায়গা, আলো জ্বালিয়ে রাখা হতো। আর এজন্য একজন খাদেমও রাখা হলো। কখনো কখনো হযরত আম্মাজান ভালোবাসার আবেগে হুযূরকে স্মরণ করাতেন– "আপনার ঐ সময়ের কথা মনে আছে কি যখন আপনি আলোতে ঘুমাতে পারতেন না। আর এখন ঘরের কোণায় কোণায় আলো না হলে আপনার ঘুমই আসে না।" হুযূর এ কথা শুনে খুশিতে মুচকি হাসতেন।

সোনামণিরা! জামাতে আহমদীয়ার মহান প্রতিষ্ঠাতা ও হযরত আম্মাজানকে যারাই খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যেমন হযরত আম্মাজানের দুই ভাই। তাঁর সন্তানরা, বউয়েরা এবং সেবিকারা সবাই এটা বলেছেন– তারা দু'জন সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন না। তাদের দু'জনের মাঝে কখনো পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ হতো না। একদিকে হুযূর হযরত আম্মাজানের প্রত্যেক কথা মানতেন। তাঁর সাথে ভালোবাসা ও অনুগ্রহের ব্যবহার করতেন। অপরদিকে হযরত আম্মাজানও হুযূরের

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পছন্দ অপছন্দের দিকে খেয়াল রাখতেন। অধিকাংশ সময় নিজে রান্না করতেন। অথবা সামনে থেকে নিজের তত্ত্বাবধানে রান্না করাতেন। তাঁর (আ.) অন্যান্য কাজেও বন্ধুর মত সহযোগিতা করতেন।

হুযূর (আ.) আম্মাজানকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন। উর্দুভাষা যা আম্মাজানের মাতৃভাষা সে ভাষায় কথা বলতেন। তবে কখনো কখনো পাঞ্জাবী ভাষাতেও কথা বলতেন। আম্মাজানও তাঁকে (আ.) সম্মানের সাথে 'হুযূর' বা 'হযরত সাহেব' বলে সম্বোধন করতেন। মোটকথা, এ দম্পতি অতুলনীয় ছিলেন। তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা এমন ছিল যার দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায় না।

একবার হযরত আম্মাজান নামায পড়ার সময় নিয়্যত বাঁধার পূর্বে হযরত আকদাসকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি সর্বদা এ দোয়া করি খোদা তা'লা যেন কখনো আমাকে আপনার রাগ না দেখান আর আমাকে আপনার পূর্বে মৃত্যু দেন।" এটা শুনে হুযূর বললেন, "আমি সর্বদা এ দোয়া করি তুমি আমার পরেও জীবিত থাক আর আমি তোমাকে নিরাপদে রেখে যাই।" আর এভাবেই হযরত আম্মাজানের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) বছর পূর্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যু হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে হযরত আম্মাজানের ধৈর্য ধারণ

২৬শে মে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল তখন হযরত আম্মাজান উদ্বিগ্ন হয়ে দোয়া করতে লাগলেন। কখনো সিজদায় পড়ে, কখনো অস্থিরভাবে পায়চারী করে এ দোয়া করতে লাগলেন, "হে চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব খোদা! আমার আয়ুও তুমি তাঁকে দিয়ে দাও।" কিন্তু ঐশী তকদীর অনুযায়ী তাঁর (আ.) সময় এসে উপস্থিত হলো। যখন তাঁর (আ.) মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলো তখন হযরত আম্মাজান এ দোয়া করলেন, "হে আমার প্রিয় খোদা! তিনি তো আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না।"

তিনি বার বার এ কথা বলে যাচ্ছিলেন। শেষে রাত দশটার সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সবাইকে শোকে বিহ্বল করে নিজের উর্ধ্বলোকের প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত আম্মাজান তখন ধৈর্যের এমন নমুনা দেখালেন যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। হৃদয়ে রক্তাশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু মুখে শুধু ছিল 'ইন্নালিল্লাহ' (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই), আর নীরবতা। তবে সেখানে উপস্থিত

কিছু মহিলা উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো, তখন তিনি তাদের অত্যন্ত জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "তিনি তো আমার স্বামী ছিলেন, আমিই কান্নাকাটি করছি না, তবে তোমরা কেন কান্নাকাটি করছো?"

কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের সন্তানদের একত্র করে এ নসিহত করলেন-

"সোনামণিরা! ঘর খালি দেখে এটা মনে করো না তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি। তিনি তোমাদের জন্য উর্ধ্বলোকে দোয়ার এক বিশাল ধন-ভান্ডার রেখে গেছেন, তোমরা প্রয়োজনের সময় তা পেতে থাকবে।"

হযূর (আ.)-এর পবিত্র লাশ লাহোর থেকে কাদিয়ান নিয়ে আসা হয়েছে। বাটালাতে হযরত আম্মাজান গরুর গাড়িতেই আরোহী ছিলেন। হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী ডিউটিতে ছিলেন। তিনি (আম্মাজান) সারা পথ দোয়ারত ছিলেন।

লাশ বেহেশতি মাকবেরা সংলগ্ন বাগানে রাখা হলে, হযরত আম্মাজান হুযূরের (আ.) পবিত্র চেহারা দেখতে আসেন, আর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গম্ভীর আওয়াজে বললেন,..... "তোমার জন্যই আমার ঘরে ফিরিশতা আসতো, খোদা বাক্যালাপ করতেন।"

এটা সে সাক্ষ্য যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ব্যাপারে আম্মাজান দিয়েছিলেন। এ থেকে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার বিষয়টি বুঝা যায়। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবি ও ইলহামসমূহকে সত্য বলে মানতেন। কখনো তাঁর হৃদয়ে (এ ব্যাপারে) কোন রকমের সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নি।

হ্যাঁ, সোনামণিরা! হযরত আম্মাজান প্রথম দিনই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন। আর দাবির পূর্ব থেকেই তিনি তাঁকে (আ.) বুযূর্গ (আল্লাহওয়ালা) মনে করতেন। এখানে আমরা তোমাদের একটি ছোট্ট ঘটনা শুনাবো। এটা হযরত আম্মাজান তাঁর মেয়ে হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যখন আমি এখানে নতুন আসি তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি কথা আমার মাঝে খুবই দাগ কাটলো। তা হলো, একবার এক সেবিকা দুধ গরম করছিল। যখন দুধ ফুটতে শুরু করলো সে ঢাকনা তুলে দিল। হঠাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টি এতে পড়ল আর তিনি বললেন, 'দুধ ঢাকনাহীন, এটি অবশ্যই ফেটে যাবে।' আমার তখন

মনে হলো দুধ ফুটার সময় ঢাকনা খুলেই দিতে হয়। এ দুধ কেন ফাটবে? পুরুষরা এ বিষয়টি জানে না, তাই তিনি এমন বলেছেন। আমার মনে এ ধারণাটিই বদ্ধমূল রইল, এমন সময় দুধ ফেটে গেল। এ ঘটনায় আমার মনে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মহিমা ও প্রতাপ প্রকাশিত হলো। আর আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করে নিলাম-তিনি একজন খুবই বড় মাপের আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আম্মাজান সম্পূর্ণরূপে বদলে যান। তাঁর স্বস্তি ও প্রশান্তি উধাও হয়ে গেল। এর পরিবর্তে তাঁর মাঝে অস্থিরতা ও অস্বস্তি বিরাজ করছিল। হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা তাঁর জীবন সম্পর্কে লিখেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর (আম্মাজান) মধ্যে এক বড় পরিবর্তনের সৃষ্টি হলো। এরপর আমি তাঁকে পুরোপুরি প্রশান্ত ও নীরব দেখি নি। আমরা ছোট হবার কারণে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য দেখাতেন। কিন্তু তাঁর মাঝে একটা সীমাহীন অস্থিরতা ও অস্বস্তি ছিল। পরে কখনো এটা শেষ হয় নি। এমন মনে হতো, তিনি এ জগতেই আছেন আবার নেইও। তিনি এমনই অস্বস্তিতে থাকতেন যেন তাঁর কোন জিনিস হারিয়ে গেছে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত আম্মাজানের অতুলনীয় ভালোবাসা সম্বন্ধে হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা লিখেন–

"তিনি অধিকাংশ সময় সফরেই থাকতেন। আর বাহ্যিকভাবে নিজেকে হাসিখুশি রাখতেন। মহিলাদের সাথে নিয়ে বাগান বা গ্রামে ভ্রমণে বের হতেন। ঘরে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। খাবার রান্না করাতেন এবং গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতেন (এ কাজ তাঁর সবচে' বেশি পছন্দ ছিল)। (তাঁর কাছে) লোকদের আসা-যাওয়া ছিল। তিনি নিজের সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন। সবই ছিল, কিন্তু হুযূরের (আ.) মৃত্যুর পর তিনি কখনো পূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করেন নি। পরিষ্কার বুঝা যেত তিনি যেন শুধু নিজের সময়টা পার করে যাচ্ছেন। যেন এটা একটা সফর, একে পূর্ণ করতে হবে। কিছু কাজ রয়েছে, একে দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি বাহ্যিকভাবে ধৈর্যের পাহাড় ছিলেন কিন্তু এক ধরনের অস্বস্তি সব সময় তাঁর মাঝে প্রকাশ পেত। তবে তিনি সন্তানদের কারণে নিজের এ কষ্টকে লুকিয়ে রাখতেন ও সবার খুশির ব্যবস্থা করতেন। যখন পরিবারে কোন শিশু জন্ম নিত তখন এ খুশি তাঁর মাঝে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিচ্ছেদের ঘটনাটি নতুন করে জাগিয়ে তুলতো। তিনি এ শিশুর আগমনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে খুবই স্মরণ করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আমি নিজের ব্যাপারেই আম্মাজানের হৃদয়

নিংড়িয়ে ভালোবাসার এক ঝরণা বইতে দেখেছি। তিনি বার-বার বলতেন, "তোমাদের পিতা তোমাদের সব কথা মেনে নিতেন। আর আমার আপত্তি করাতে বলতেন, মেয়েরা তো কয়েকদিনের মেহমান হয়ে থাকে, তারা আর কিই বা চাইবে? যা তারা বলে, তা-ই কর।"

মোটকথা, এ ভালোবাসা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এরই ভালোবাসা, যা তাঁর হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হজ্জ করার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার কারণে তা করতে পারেন নি। হযরত আম্মাজান তাঁর (আ.) মৃত্যুর পরেও তাঁর এ ইচ্ছাকে স্মরণ রেখেছেন। আর নিজে খরচ দিয়ে এক ব্যক্তিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করিয়ে এ ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন। তাঁর এটা অভ্যাস ছিল যখনই হুযূর (আ.)-এর কথা স্মরণ হতো তিনি কুরআন শরীফ পড়া শুরু করে দিতেন।

তিনি আরো অনেকভাবে হুযূর (আ.)-এর স্মৃতিকে জীবন্ত রাখতেন। তাঁর এটা একটা পন্থা ছিল, তিনি প্রতিদিন বেহেশতী মাকবেরায় গিয়ে হযরত আকদাসের কবরের পাশে দোয়া করতেন। হুযূরের (আ.) যে খাবার পছন্দ ছিল তা রান্না করিয়ে বা নিজে রান্না করে লোকদের খাওয়াতেন আর বলতেন খাও, এটা হুযূরের খুবই পছন্দ ছিল।

কাদিয়ানের প্রতি হযরত আম্মাজানের অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল। পাকিস্তান হবার পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন চিরস্থায়ীভাবে রাবওয়া চলে আসেন, তখন হযরত আম্মাজানের সাথে মোহতরমা আপা আমেনা সাহেবা (চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের স্ত্রী) ছিলেন। তিনি বলেন, যে ঘরে আমরা খাবার খাই, হযরত আম্মাজান সে ঘরের বারান্দায় আসলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। কথা প্রসঙ্গে আমি কিছু কথা এমন বলেছি, যাতে প্রকাশ পেয়েছে, "রাবওয়া কাদিয়ানের মতই লাগে। এটা কাদিয়ানের দু:খকে দূর করবে।" হযরত আম্মাজান আমার পাশে শোয়া ছিলেন। তৎক্ষণাৎ শোয়া থেকে উঠে বসে গেলেন। আমার কাঁধে কিছুটা ঝাঁকুনি দিয়ে কষ্টভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, "যেখানে হুযূর দাফন হয়েছেন তুমি সে জায়গাকে ভুলে যাবে!"

একবার হযরত আম্মাজান লাহোরের নীলাগুম্বাদে হযরত আব্দুল্লাহ্ সাহেবের বাড়িতে যান। গৃহবাসীরা হযরত আম্মাজানকে বললেন, এ ঘরটি খুবই সংকীর্ণ, আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের এর চেয়ে ভালো বাড়ি দান করেন।

একথা শুনে হযরত আম্মাজান বললেন, "না, এ বাড়িই তোমাদের জন্য অত্যন্ত বরকতমন্ডিত। কেননা এখানে হুযূর (আ.) এসেছেন। এ বাড়ি ছেড়ে দিও না।"

এভাবে যে ঘরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) থেকেছেন, যে রাস্তায় তাঁর পবিত্র পদচারণা হয়েছে, এগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন আর তিনি এগুলোকে বরকতমন্ডিত মনে করতেন। হযরত আম্মাজানের প্রত্যেক কথা ও কাজ প্রকাশ করে দিত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর কত ভালোবাসা, আর কেমন বিশ্বাস ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (সা.)-এর বন্ধু-বান্ধব এবং যে সব সেবক সত্যিকার অর্থে তাঁকে ভালোবাসতো তাদেরকে ও তাদের সন্তান-সন্ততিকেও হযরত আম্মাজান ভালোবাসতেন। এমনকি তাঁদের ছোট ছোট প্রয়োজনেরও খেয়াল রাখতেন, যেভাবে- একজন মা তার নিজ সন্তানদের খেয়াল রাখে।

তোমাদেরকে এখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর একটি ঘটনা বলছি, যা থেকে হযরত আম্মাজানের ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি বুঝা যাবে। যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে মুহাম্মদী বেগমের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করলেন, তখন হুযূর (আ.) দেখলেন, হযরত আম্মাজান পৃথকভাবে নামায পড়ে কান্নাকাটি করে দোয়া করছেন। তিনি (আ.) পরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি দোয়া করছিলে?" হযরত আম্মাজান উত্তরে বললেন, আমি এ দোয়া করছিলাম, "হে আমার খোদা! তুমি এ ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের ফযল (আশীস), শক্তি ও মহিমা দ্বারা পূর্ণ কর।" তিনি (আ.) বললেন, "তুমি এ দোয়া করেছ! তুমি কি জান না? তোমার এ দোয়ার পরিণতিতে তোমার সতীন আসবে।" হযরত আম্মাজান দ্বিধাহীনভাবে বললেন, "যাই হোক, আমার নিজের কষ্টের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার খুশি এতেই, খোদার কথা ও আপনার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।"

সতীন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আম্মাজানের ব্যবহার

বিয়ের পর যখন তিনি কাদিয়ানে আসলেন, তখন সব আত্মীয়-স্বজনকে হুযূরের (আ.) বিরোধী দেখতে পেলেন। এমনকি যে কয়েকজন সেবক ছিল ঘরের লোকেরা তাদেরও তাঁর (আ.) থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। হুযূরের (আ.) প্রথম স্ত্রীর ব্যবহারের কারণে তাঁর সাথে সম্পর্ক না থাকার মতই ছিল, এমনকি বিশ বছর যাবৎ তিনি পৃথক জীবন-যাপন করছিলেন। ঘরের আত্মীয়-স্বজন মহিলারা এটা চাইতো না, কেউ হুযূরকে তোহ্‌ফা হিসেবে খাবার পাঠাক আর তিনি নিজেও খাবারের কোন খেয়াল রাখতেন না। এ অবস্থায় হযরত

আম্মাজানকে বিয়ে করে নিয়ে আসাটাও তাদের কাছে খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু আম্মাজান সবকিছু ভুলে গিয়ে সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। হুযূরের (আ.) কাছে অনুমতি নিয়ে তাঁর প্রথম স্ত্রী, সন্তান (প্রথম স্ত্রীর), ভাবী ও অন্যান্যদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছেন। তিনি সবার খুবই খেয়াল রাখতেন, প্রয়োজনের সময় তাদের উপকার করতেন ও সব ধরনের সাহায্য করতেন।

হযরত আম্মাজান নিজে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। একবার হযরত সুলতান আহমদ সাহেবের মা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখতে যান। তিনি ফিরে এসে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে বললেন, তার এ ধরনের কষ্ট হচ্ছে। প্রথমে তিনি (আ.) নীরব ছিলেন। দ্বিতীয়বার বলার পর বললেন, "আমি তোমাকে দু'টি ঔষধের বড়ি দিচ্ছি তা দিয়ে আস, কিন্তু তা নিজের পক্ষ থকে দিবে। আমার নাম মধ্যে আনবে না।" হযরত আম্মাজান বললেন, "আরো কয়েকবার হুযূর আমাকে ইশারা-ইঙ্গিতে বলেছেন, আমি যেন নিজের পক্ষ থেকে এমনভাবে সাহায্য করি, আর হুযূরের নাম না নেই। অনেকবার আমি এমন করেছি।"

হাজারো এমন কাহিনী তোমরা শুনেছ যাতে সতীনদের পারস্পরিক ঝগড়া, সৎ মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু হযরত আম্মাজান যেহেতু সাধারণ মহিলাদের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। প্রথমত তিনি নিজে নেক ও মুত্তাকী ছিলেন আর খুবই উচ্চমানের ধৈর্য ও সাহস রাখতেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মাঝে হুযূরের সান্নিধ্য ও তরবিয়তের প্রভাব ছিল। তাই তিনি তাদের শত্রুতা সত্ত্বেও হুযূরের আত্মীয়-স্বজন, নিজের সৎ সন্তান ও সতীনের সাথে সর্বদা উত্তম ব্যবহার করেছেন।

খোদার দৃষ্টিতে হযরত আম্মাজানের পদমর্যাদা

হযরত আম্মাজান নিজের পবিত্র ইচ্ছা ও পুণ্য কর্মের কল্যাণে নিজের খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অনেক ইলহাম করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এক ইলহামে আল্লাহ তা'লা নিজে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর ঐ সুসংবাদপ্রাপ্তা স্ত্রীর সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন–

رَبِّ اَصِحَّ زَوْجَتِیْ هٰذِهٖ

"রাব্বি আসিহ্হা যাওজাতি হাযিহি" অর্থ- হে আমার খোদা! আমার এই স্ত্রীকে অসুস্থ হওয়া থেকে নিরাপদে রাখ আর রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থতা দান কর।"

এ আত্মীয়তাকে আল্লাহ তা'লা প্রশংসাযোগ্য পুরস্কার আখ্যা দিয়েছেন আর বলেছেন, (অনুবাদ) "এটা ঐ আল্লাহ তা'লার প্রশংসা যিনি জামাতা ও সন্তানাদি দুই দিক থেকে তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন।"

তাঁর বয়সের ব্যাপারে এ ইলহামী দোয়া শিখানো হয়েছে- (অনুবাদ) "হে আমার প্রভু! আমার বয়স ও আমার সঙ্গিনীর বয়স অসাধারণভাবে বাড়িয়ে দাও।"

এ দোয়া অসাধারণভাবে পূর্ণ হয়েছে। তিনি খুবই দীর্ঘায়ু পেয়েছেন। আর যেভাবে এক ইলহামে বলা হয়েছিল,

"تو دُور تک کی نسل دیکھے گا۔"

"তুমি দূরবর্তী বংশধর দেখবে।" হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এ বংশ লতিকা হযরত আম্মাজান থেকে চলার ছিল, এ কারণে তিনি (আম্মাজান) এ ইলহামের দ্বিতীয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আর এ ইলহাম তিনি অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখেছেন।

হযরত আম্মাজানের খোদার সান্নিধ্য অর্জিত হয়েছিল, ইলহাম হয়েছে, (অনুবাদ) "আমি তোমার ও তোমার স্ত্রীর সাথে আছি।"

অর্থাৎ ইলহামী ভাবেও আল্লাহ তা'লার সান্নিধ্য তাঁর অর্জিত হয়েছিল। তাঁর বিয়ের পর আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন, (অনুবাদ) "আমার ঐ নেয়ামতকে স্মরণ রেখ, যা আমি তোমাকে দান করেছি। আমি তোমার জন্য নিজের হাতে নিজের রহমত ও কুদরতের এ বৃক্ষ লাগিয়েছি।"

হযরত আম্মাজানের সন্তানাদি

আল্লাহ তা'লা হযরত আম্মাজানকে ১০ (দশ) সন্তান দান করেছেন। পাঁচ জন অল্প বয়সে মারা গেছেন আর পাঁচ জন ইলহাম অনুযায়ী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। যেসব সন্তান অল্প বয়সে মারা গেছেন তাঁদের নাম হল–

১। সবার বড় মেয়ে– সাহেবযাদী ইসমত
জন্ম- ১৫ই এপ্রিল ১৮৮৬ইং, মৃত্যু- জুলাই ১৮৯১ইং।

২। সাহেবযাদা বশীর আওওয়াল
জন্ম- ০৭ই আগষ্ট ১৮৮৭ইং, মৃত্যু- ০৪ই নভেম্বর ১৮৮৮ইং।

৩। সাহেবযাদী শওকত
জন্ম- ১৮৯১ইং, মৃত্যু- ১৮৯২ইং।

ডানদিক থেকে : সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.), সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.), সাহেবযাদী নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা.) ও সাহেবযাদী আমাতুল হাফীয সাহেবা (রা.)।

৪। সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ

জন্ম- ১৪ই জুন, ১৮৯৯ইং, মৃত্যু- ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ইং।

৫। সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসির

জন্ম- ২৮শে জানুয়ারি ১৯০৩ইং, মৃত্যু- ৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩ইং।

আল্লাহ্ তা'লা যে সন্তানদের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন ও বংশধারাকে প্রবাহমান রেখেছেন আর যাঁদের ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন–

"یہ پانچوں جو کہ نسلِ سیدہ ہیں"

"এই পাঁচ জন সন্তান যারা সৈয়্যদার বংশধর।" এরাঁ সবাই হলেন সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তান। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো এই :

১) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.)

তাঁর জন্ম ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং সালে। তিনি জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় ইমাম (খলীফা) হন। তাঁর সম্বন্ধে "ফযলে ওমর" ও "মুসলেহ মাওউদ" ইলহাম হয়েছে। এক দীর্ঘ সময় ধর্মের সেবা করার পর ১৯৬৫ইং সনের ৭ ও ৮ নভেম্বরের মধ্যরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

২) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (এম.এ) (রা.)

তিনি ২০শে এপ্রিল ১৮৯৩ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। এক দীর্ঘ জীবন লাভের পর ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সারা জীবন জামাতের সেবায় অতিবাহিত করেছেন।

৩) হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)

তিনি ২৪শে মে ১৮৯৫ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাপারে একটা ইলহাম ছিল,

"وہ بادشاہ آیا"

"ওহ বাদশাহ্ আয়া" (সেই বাদশাহ এসেছে)। তিনিও দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন আর আজীবন জামাতের খেদমত করেছেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

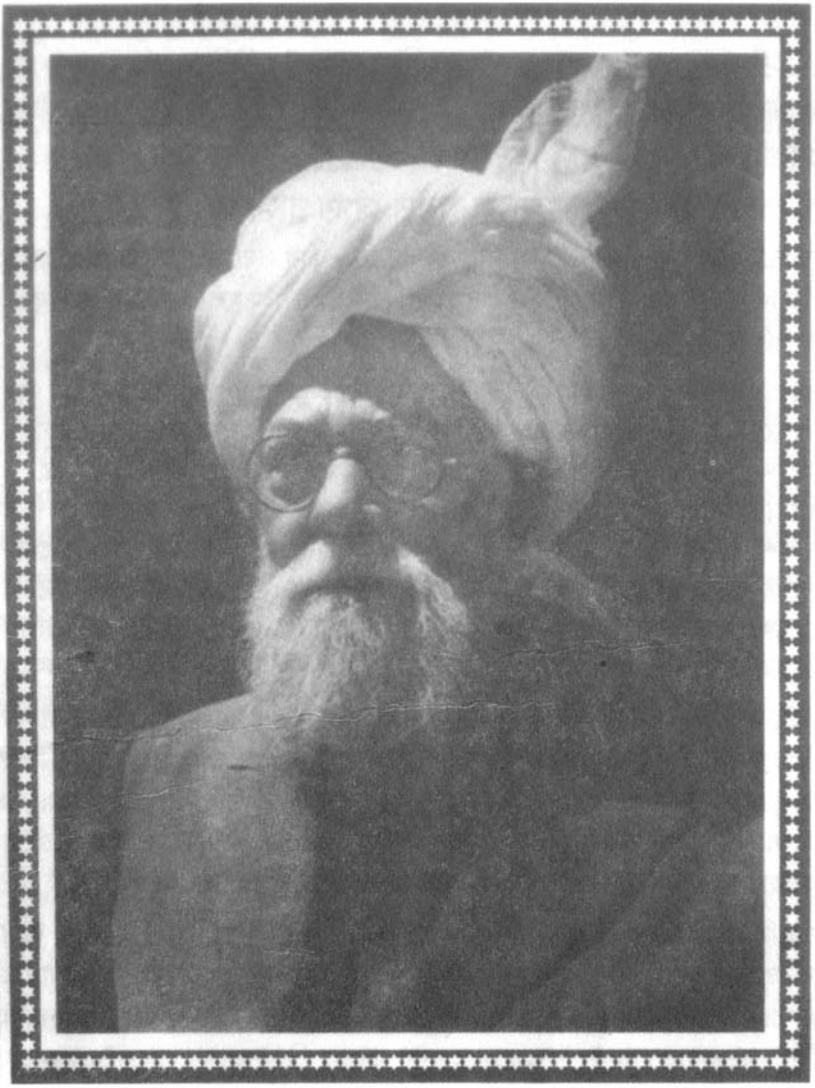

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

হযরত আম্মাজানের পুত্র

৪) হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা

তিনি ২রা মার্চ, ১৮৯৭ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইলহাম হলো–

"نواب مبارکہ بیگم" "নওয়াব মোবারাকা বেগম।" তিনি অত্যন্ত দোয়ানিষ্ঠ, জ্ঞানী, ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। ধর্মের সেবায় আজীবন লেগেই ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৩ শে মে তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

৫) হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা

তিনি ২৫ শে জুন ১৯০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইলহাম হলো "দোখতে কেরাম" (সম্মানিত মেয়ে)। তিনি ১৯৮৭ সালের ৬ই মে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর (হযরত আম্মাজান) এ পাঁচ সন্তানকে আল্লাহ তা'লা দীর্ঘায়ু দান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে সন্তানও দান করেছেন। আর আম্মাজান নিজের অনেক পরবর্তী বংশধরও দেখেছেন। তিনি প্রপৌত্র, প্রপোত্রী, প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রীগণকেও দেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর জীবিত বংশধরের সংখ্যা ছিল একশ' এগার (১১১) জন। আর ২০ (বিশ) জনের মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ মোট সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৩১ (একশত একত্রিশ) জন। কারো জীবদ্দশায় নিজের চোখে দেখা বংশধরের এ সংখ্যা এক অসাধারণ সংখ্যা। এটা বিশাল সৌভাগ্য।

তাঁকে খোদা তা'লা অত্যন্ত সম্মান দান করেছিলেন। তাঁর স্বামী খোদার মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁর বড় ছেলেকে জামাতে আহমদীয়ার খেলাফত দান করেছেন ও তাঁকে মুসলেহ মাওউদ উপাধি দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে যখন হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবি করেন, তখন হযরত আম্মাজান এ উপলক্ষে লিখেন–

"আমি আমার খোদার প্রশংসা কিভাবে আদায় করবো কেননা তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র সত্তার (প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর) স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ও আমার মাথার উপরে তিনি এক বড় পুরস্কারের মুকুট রেখে দিয়েছেন। আমি পুনরায় কিভাবে আমার খোদার কৃতজ্ঞতা আদায় করবো তিনি আমার ছেলে মাহমুদকে "মুসলেহ মাওউদ" এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে আমার জীবনের শেষভাগে আমাকে দ্বিতীয় মুকুট দান করেছেন। সুতরাং আমাকে আমার

জীবনের শুরুতেও মুকুট দান করা হয়েছে আর শেষেও। এটা আমার খোদার ফযল ও অনুগ্রহ। এতে আমার কোন কামনা-বাসনা, কর্ম ও কোন ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্রও শামিল ছিল না। আর এ দুই মুকুট শুধু আমারই স্বত্ত্ব নয়, বরং এতে আমার সাথে আমার জামাতেরও সমান অংশ রয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লার প্রত্যেক বিশেষ পুরস্কার নিজের সাথে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আসে। তাই আমার দোয়া হচ্ছে, হে খোদা তা'লা! আমাকে এবং জামাতকে এ গুরুদায়িত্ব পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, যা তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। হে আমাদের খোদা! এমনই কর। (আমীন)*

ওয়াসসালাম।

মাহমুদের মা

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৪ (আল ফুরকান, মুসলেহ মাওউদ সংখ্যা,
এপ্রিল, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা-৩)

আরেকটা পুরস্কার আল্লাহ তা'লা তাঁকে তাঁর (হযরত আম্মাজান) মৃত্যুর পর দান করেছেন। তাঁর সে নাতি যাঁর ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর ইলহাম হয়েছে–"নাফিলাতাল লাক" (অনুবাদ- তোমার নাতি হবে)। তিনি তাঁকে [খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)] নিজের ছেলের মত লালন-পালন করেছেন আর নিজের হাতে তাঁকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁকেও জামাতে আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা বানিয়েছেন। [অর্থাৎ হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)]। এখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই (আম্মাজানের) আরেক নাতি অর্থাৎ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-কে জামাতের চতুর্থ খলীফা বানিয়েছেন। [বর্তমানে হযরত আম্মাজানের প্রপৌত্র এবং হযরত মীর্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পৌত্র হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে আল্লাহ তা'লা জামাতের পঞ্চম খলীফা বানিয়েছেন- অনুবাদক।]

---

* নোট : (এ লেখাটা এমনভাবেই নকল করা হয়েছে যাতে সোনামণিদের হযরত আম্মাজানের লেখা সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যায়।)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব
খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)
হযরত আম্মাজানের পৌত্র

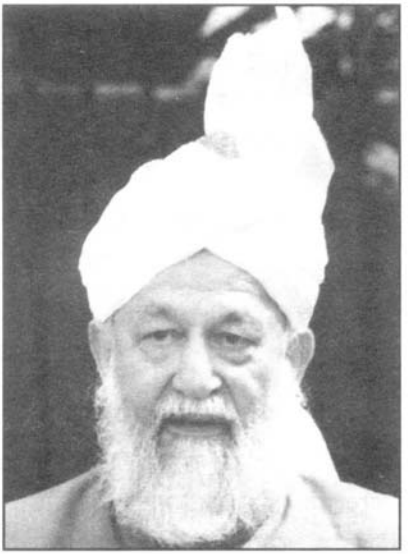

হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব
খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে.)
হযরত আম্মাজানের পৌত্র

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইঃ)
হযরত আম্মাজানের প্রপৌত্র

দ্বিতীয় অংশ

হযরত আম্মাজানের স্বভাব চরিত্র

আল্লাহ তা'লা হযরত আম্মাজানকে কেন নিজের মা'মুরের (প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ) জন্য বেছে নিয়েছেন? এ বিষয়টি তাঁর জীবনের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায়। তাঁর জীবনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় ছিল ইবাদত। তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামায অত্যন্ত মনোযোগ, নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সাথে বাজামাত আদায় করতেন। শুধু ফরয নয়, বরং তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ এবং চাশতের নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। নফল নামায ছাড়া যখনই তিনি সুযোগ পেতেন নামাযের মাধ্যমে হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলতেন, মহানবী (সা.)-এর প্রিয় বাক্য, "আমার চোখের স্নিগ্ধতা নামাযে" এটা আম্মাজানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তিনি নামায ছাড়া অন্য সময়ে যেমন উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে উচ্চ শব্দে দোয়া করতেন। কোন কোন সময় বসে বসে জোরে বলতেন **ইয়া আল্লাহ্** (হে আমার আল্লাহ্)! এবং দোয়া শুরু করে দিতেন। আর এভাবে মশগুল হতেন পাশে যারা বসতো তাঁরাও অজান্তেই তাঁর সাথে দোয়ায় শামিল হয়ে যেত। হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি এমন ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করতেন যেন মনে হতো নি:শ্বাস বন্ধ হবার পর দ্বিতীয়বার শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে শুরু করেছে।

কখনো কখনো তিনি কোন পংক্তি বা কবিতা পাঠ করে দোয়া করতেন। একবার লাহোরে খোদার এক অনাবাদি ঘর (মসজিদ) দেখে আফসোস করে বলেন, "হে খোদা! এ ঘরগুলো (খোদার ঘর) আবাদ কর, আর গির্জাগুলো ধ্বংস কর।"

তাঁর দোয়ায় গোটা জামাত অন্তর্ভুক্ত থাকতো। তিনি সবার জন্য দোয়া করতেন। অনেকের নাম নিয়ে তিনি অত্যন্ত আকুতির সাথে দোয়া করতেন। একবার শুয়ে শুয়ে এমনভাবে **ইয়া আল্লাহ্** (হে আল্লাহ্) বলছিলেন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু এর পরই তিনি এ বাক্য বললেন, "আমার নাইয়্যারকে* ছেলে দাও।"

খোদা তা'লা নাইয়্যার সাহেবকে দু'টি ছেলে দান করেছিলেন। তিনি সত্যিকার অর্থে সমস্ত জামাতের **'মা'** ছিলেন।

---

* নোট- হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম নাইয়্যার সাহেব, যিনি আফ্রিকার প্রথম মুবাল্লিগ (প্রচারক) ছিলেন।

তিনি নিজেই শুধু নামাযে নিষ্ঠাবান ছিলেন না, বরং অন্য লোকদেরও এর তাগিদ করতেন। কোন বিশেষ ঘটনা হলে, সেটা নিজের বা অন্যদের হোক, সবাইকে নিয়ে দোয়া করতেন। বিশেষ করে শিশুদের দিয়ে অবশ্যই দোয়া করাতেন। আর বলতেন, "ছোটমণিরা নিষ্পাপ হয়ে থাকে, এজন্য খোদা তা'লা ছোটমণিদের দোয়া খুবই শুনেন।"

খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খান সাহেবের স্ত্রী একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রথম মেয়ে জন্মের পর একবার হযরত আম্মাজানের কাছে দোয়া চাইতে এলেন। তখন নামাযের সময় ছিল। আম্মাজান নামায পড়তে চলে গেলেন আর ফিরে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মেয়ে! তুমি কি নামায পড়ে নিয়েছো?" তিনি উত্তর দিলেন, "বাচ্চা প্রস্রাব করেছে, তাই ঘরে গিয়ে নামায পড়ে নিব।" এতে হযরত আম্মাজান বললেন, "শিশুদের বাহানায় নামাযকে নষ্ট করো না, এভাবে শিশুরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে যায়। শিশুরা তো খোদা তা'লার পুরস্কার।" তিনি সর্বদাই বলতেন দোয়া বৃথা যায় না। একভাবে কবুল (গৃহিত) না হলেও তা অন্যভাবে কবুল হয় বা ইবাদতে গণ্য হয়।

কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ঘরে একটা ছোট কামরা রয়েছে। এটাকে "বায়তুদ্দোয়া" বলা হয়। এটা হুযূর (আ.) ও আম্মাজানের কামরার সাথে বানানো হয়েছে। আর তাঁর (আম্মাজান) কামরা থেকেই এ কামরার (বায়তুদ্দোয়া) রাস্তা। হযরত আম্মাজান এর (কামরার) দরজা থেকে বায়তুদ্দোয়ায় প্রবেশের দরজা পর্যন্ত রশি বেঁধে এতে পর্দা টানিয়ে দেন। এ পর্দার পিছনে তাঁর খাট বসানো ছিল, যাতে বায়তুদ্দোয়ায় যাতায়াতকারী লোকেরা স্বাচ্ছন্দে যেতে পারে এবং বেপর্দা বা কষ্ট না হয়। জামাতের যে-ই বায়তুদ্দোয়ায় দোয়া করতে যেতে চাইতো তিনি তাকে অত্যন্ত খুশিতে এর অনুমতি দিতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ কামরায় নফল নামায পড়তেন ও দোয়া করতেন। এজন্য এর নাম 'বায়তুদ্দোয়া' রাখা হয়েছে। একবার এক মহিলা এলেন আর বায়তুদ্দোয়ায় নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি হেসে বললেন, "আমরা তো কোন ট্যাক্স লাগাই নি।"

এরপর যখন ঐ মহিলা কামরাতে প্রবেশ করতে শুরু করলেন তখন তিনি বললেন, "হ্যাঁ, একটা ট্যাক্স আছে, আর তা হলো আমার জন্য দোয়া করা।"

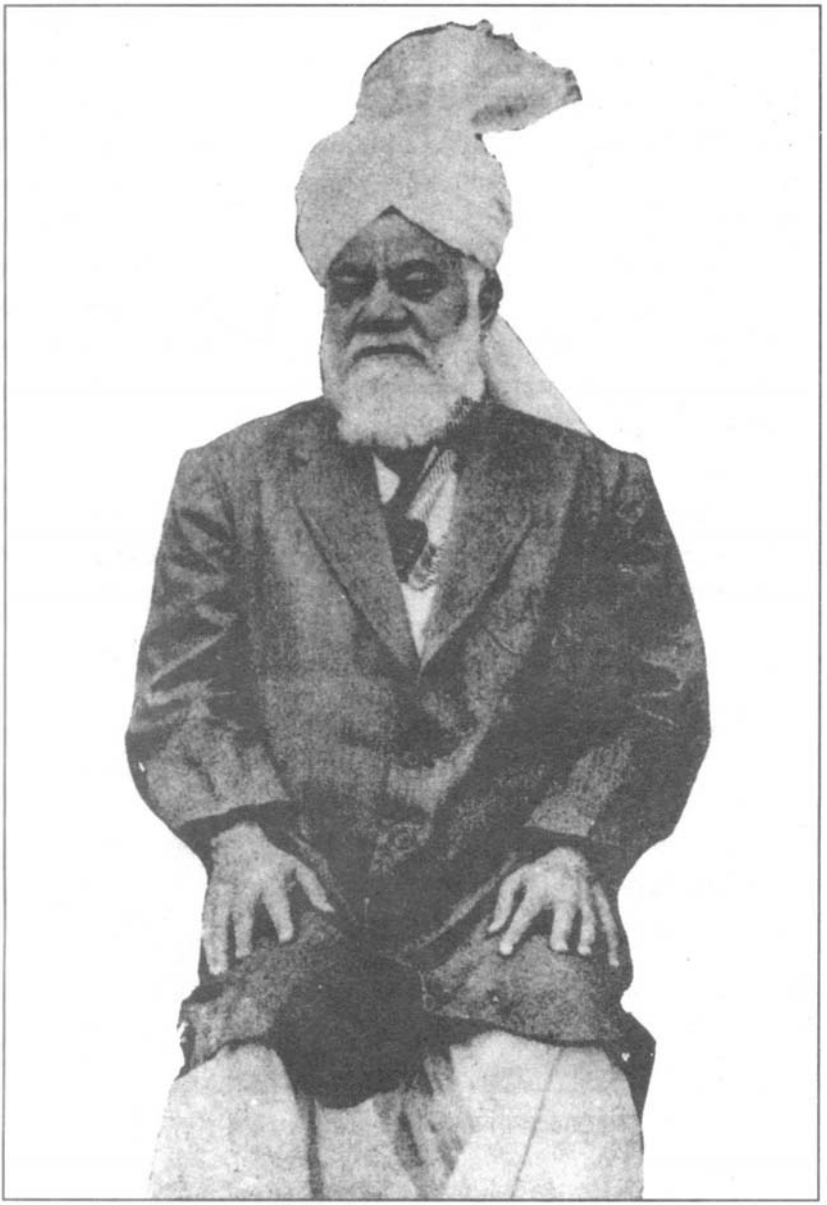

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.)

হযরত আম্মাজানের পুত্র

একবার মুহাশেহ্ মুহাম্মদ উমর সাহেব (মুরব্বী) মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে বায়তুদ্দোয়ায় দোয়া করার উদ্দেশ্যে আসেন। আম্মাজানের কাছে অনুমতি চান। আম্মাজান বললেন, আট ও নয়টার মাঝামাঝি সময়ে এসো। তিনি বলেন, আমি সময়মত গিয়ে উপস্থিত হই। দরজার কড়া নাড়ি। এক সেবিকা বের হয়ে এলো। জিজ্ঞেস করায় বললাম, হযরত আম্মাজানের অনুমতি নিয়ে বায়তুদ্দোয়ায় দোয়া করার জন্য এসেছি। সেবিকা বলল, "কয়েকজন মহিলাকে খাবার খাওয়ার জন্য আম্মাজান এখানে ডেকেছেন, আপনি কাল সকালে আসুন।" আমি বললাম, আপনি আম্মাজানের কাছে গিয়ে নিবেদন করুন, আমি আজই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। এতে ঐ সেবিকা ভেতরে চলে গেল, আর ফেরত এলো না। পরে আবার দরজার কড়া নাড়লাম। মাই কাকো সাহেবা বাইরে এলেন। আমি পুরো বিষয়টা তাঁকে বলালম। আমার কথা শুনে তিনি ভেতরে চলে গেলেন আর অল্প সময় পরে এসে বললেন, হযরত আম্মাজান বলেছেন, "আমরা দাওয়াতের সময় সাড়ে নয়টা করে দিয়েছি আপনি এখন দোয়ার জন্য ভিতরে যেতে পারেন।" এভাবে তিনি প্রত্যেকের ইচ্ছাকে পূরণ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় এ দোয়াগুলো উচ্চ:স্বরে পড়তেন–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۔
يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ يَا رَبِّيْ وَرَبَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۔

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীসু ইয়া রাব্বী ওয়ারাব্বিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।

অনুবাদ- আল্লাহ্ নিজ প্রশংসাসহ পবিত্র, আল্লাহ্ অতীব পবিত্র ও মহান। হে চিরঞ্জীব-জীবনদাতা! হে চিরস্থায়ী-স্থায়ীত্বদাতা! আমি তোমার করুণার দোহাই দিয়ে তোমার সাহায্য কামনা করছি। হে আমার এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রভু প্রতিপালক।

কাদিয়ান থেকে হিজরতের পর তিনি এ দোয়াও খুব বেশি পড়তেন–

يَا حَفِيْظُ يَا عَزِيْزُ يَا رَفِيْقُ ۔ رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ
فَاحْفَظْنَا وَانْصُرْنَا وَارْحَمْنَا ۔

হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)

হযরত আম্মাজানের পুত্র

ইয়া হাফীযু ইয়া আযীযু ইয়া রাফীকু রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওনানসুরনা ওয়ারহামনা।

অনুবাদ : হে সুরক্ষাদানকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু! হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক। হে আমার প্রভু! সুতরাং তুমি আমাদের রক্ষা কর ও তুমি আমাদের সাহায্য কর আর তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর।

আমরা যারা ছোট ছিলাম তাদেরও তিনি এ দোয়া শিখিয়েছেন। আর বলতেন এ দোয়া খুব বেশি করে পড়। এ দোয়া এ যুগের 'ইসমে আযম" অর্থাৎ সবচেয়ে বড় দোয়া। যখনই তিনি সফরে যেতেন তখন এ দোয়া অবশ্যই পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا۔

বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা

অনুবাদ : আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি।

খোদা তা'লা, তাঁর কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর (আম্মাজানের) অগাধ ভালোবাসা ছিল। তিনি প্রতিদিন কুরআন করীম তেলাওয়াত করতেন। বরং অধিকাংশ লোক এটাও বলেছেন, তাঁর যখন কোন কষ্ট হতো বা হুযূরের (আ.) কথা স্মরণ হতো তখন তিনি কুরআন শরীফ পড়া শুরু করতেন। তিনি হৃদয়ের প্রশান্তি কুরআনের মাঝে খুঁজতেন ও লাভ করতেন। যখনই কোন সমস্যা হতো তিনি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করে দিতেন। আর বলতেন, জানি না কেন লোকেরা এতো প্রিয় সূরাকে শুধু মৃত্যুর সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে? অথচ হুযূর (আ.) বলতেন, কষ্টের সময় সূরা ইয়াসীন পড়লে কষ্ট দূর হয়ে যায়।

তাঁর হাদীস শুনার অসীম আগ্রহ ছিল। পরিবারের কোন না কোন শিশুকে ডেকে প্রতিদিন হাদীস শুনতেন। কখনো ঐ এতীম শিশু যাদেরকে তিনি নিজে লালন-পালন করেছেন, তাদের কাউকে নিজের পাশে বসিয়ে তাদের দ্বারা হাদীস পড়াতেন এবং নিজে শুনতেন। মৃত্যুর নিকটবর্তী অসুস্থতার সময় এ আগ্রহ আরো অনেক বেশি বেড়ে যায়, যে শুনাতো সে ক্লান্ত হয়ে যেত, তবুও তাঁর তৃষ্ণা নিবারিত হতো না।

তিনি রসূল করীম (সা.)-এর সুন্নতের উপর পুরোপুরি আমল করার চেষ্টা করতেন। একবার এক ব্যক্তি আমের মুকুল অবস্থায় বাগানের ফল ৬০০ (ছয়শ') টাকায় ক্রয়ের জন্য মুন্‌শী সাহেবের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালো। হযরত আম্মাজান এটাকে নাকচ করে দিলেন। আর উত্তরে বললেন, এটা নাজায়েয

কাজ। যখন বাগানে ফল ধরলো তখন এটা খুব কম দামে বিক্রি হলো। সে লোক মুন্‌শী সাহেবকে বলল, ছয়শ' টাকা নিয়ে নিলে ভালো হতো! এখন দেখ, কত কম টাকা পেয়েছো। এতে মুন্‌শী সাহেব উত্তরে বললেন, "আম্মাজান যেটাকে নাজায়েয মনে করেন সেটা কিভাবে নেয়া যেতে পারে?"

কয়েদীদের খাবার খাওয়ানো সুন্নত। এ কারণে হযরত আম্মাজান যখন বাটালায় গেলেন, তখন তিনি ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ খান সাহেবকে বললেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন এখানকার জেলের কয়েদীদের আমাদের পক্ষ থেকে ভালো খাবার খাওয়ানোর অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা? তিনি তাঁর কোন পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করলেন। হযরত আম্মাজান তাঁকে খাবার তৈরীর জন্য পঞ্চাশ টাকা দিলেন আর এভাবে কয়েদীদের ভালো খাবার খাওয়ানো হলো। এরা সম্ভবত ঐ কয়েদী যারা ঋণের কারণে কয়েদী হয়েছিল।

কুদরতে সানীয়ার (খেলাফতের) সাথে গভীর সম্পর্ক

কুদরতে সানীয়ার (খেলাফতের) প্রতি হযরত আম্মাজানের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। যুগ ইমামের আনুগত্য করা ও তাঁর সব আদেশ মান্য করাকে তিনি ফরয মনে করতেন। কুদরতে সানীয়ার প্রথম বিকাশস্থল হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন–

"আমার যে আনুগত্য মিয়া মাহমুদ ও হযরত আম্মাজান করেছেন তা আর কেউ করে নি।" আর একবার তিনি কোন একজনকে বলেছেন, "হযরত বিবি সাহেবা (অর্থাৎ হযরত আম্মাজান) আমার অবস্থা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন, একবার আমাকে কিছু নগদ টাকা দিয়ে বললেন, এটা আপনার খাবারের জন্য। সাথে আরো কিছু টাকা দিলেন লঙ্গরখানার জন্য। আর বললেন, তবে দ্বিতীয় অংশ থেকে দিবেন না।"

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় তাঁর যুগ ইমামের প্রতি কেমন সম্মান ছিল! জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) তাঁকে যে কাজই করতে বলতেন তিনি নিজেই সে কাজ করে দিতেন। একবার হুযূরের (রা.) কাছে কিছু ছেলে পড়ার জন্য এসেছিল। তাদের মাঝে একজন ছিল গ্রামের ছেলে। একদিন সে খাবারের সময় কান্না শুরু করলো। জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, সে লাচ্ছি খেতে অভ্যস্ত কিন্তু এখানে সে তা পাচ্ছে না। হুযূর আম্মাজানকে ঘটনা শুনিয়ে বললেন, আপনি আপনার ঘর থেকে লাচ্ছি পাঠিয়ে দিতে থাকুন। সুতরাং তিনি প্রতিদিন এ ছাত্রের জন্য লাচ্ছি পাঠিয়ে দিতেন।

একবার কিছু লেপ মেরামতের প্রয়োজন ছিল। হুযূর (রা.) [খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রা.)] সূফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব অমৃতসরীকে বললেন, এগুলো হযরত আম্মাজানের কাছে পাঠিয়ে দিন। এটা শুনে তাঁর কষ্ট হলো, আম্মাজানকে দিয়ে এমন কাজ করানো হবে! তাঁর চেহারার মলিন অবস্থা দেখে হুযূর (রা.) [খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রা.)] বুঝে গেলেন আর বললেন, "তিনি আমাকে বলে রেখেছেন আমি যেন তাঁকে কাজ দেই।" হযরত আম্মাজান নিজ হাতে লেপ সেলাই করে পাঠিয়ে দিলেন।

একবার হুযূর (রা.) [খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রা.)] তাঁকে বললেন, "আপনি আপনার গয়েরআহমদী আত্মীয়া মহিলাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।" আর পরামর্শ দেন, প্রথমে আপনি তাদের ঘরে যাবেন পরে তাদের দাওয়াত দিবেন। হযরত আম্মাজান তাঁর ইমামের আদেশ পালন করেছেন। এ মহিলাদের সাথে মিলামিশা শুরু করেছিলেন। আর এভাবে অনেক আত্মীয়া মহিলা আহমদী হয়েছিলেন।

হযরত আম্মাজানের এ রীতি ছিল, তিনি যখনই কোন শহরে যেতেন তখনই হুযূরের অনুমতি নিয়ে যেতেন। আর এটা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগেও হতো। যদিও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর পুত্র ছিলেন, তবুও জামাতে আহমদীয়ার খলীফা হওয়ার পর হযরত আম্মাজান তাঁর সম্মান ও আনুগত্য সেরূপ করেছেন যেরূপ একজন যুগ খলীফার হওয়া প্রয়োজন।

হযরত আম্মাজানের আর্থিক কুরবানি

জামাতে আহমদীয়ার জন্য হযরত আম্মাজান অনেক বড় বড় কুরবানি করেছেন। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা 'মিনারাতুল মসীহ' বানানোর তাহ্‌রীক করেন। আর তিনি একশত একজন সেবককে বলেন, আপনারা একশ' একশ' করে টাকা দেবেন। তখন আম্মাজান ১০০০ (এক হাজার) টাকার অঙ্গীকার লিখালেন আর নিজের দিল্লীর এক বাড়ি বিক্রি করে সে অর্থ পরিশোধ করে দিলেন।

যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) "তাহ্‌রীকে জাদীদের" ঘোষণা দিয়ে চাঁদার আহ্বান করলেন, তখন আম্মাজান তাতেও অধিক পরিমাণে অংশ নিয়েছেন। দপ্তর আওওয়াল-এ মৃত্যু পর্যন্ত ৩১৪২ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। এছাড়াও যে চাঁদার তাহ্‌রীক-ই হতো তিনি এতে অংশ নিতেন ও এক বড় অংশ আদায় করতেন। উদাহরণস্বরূপ জামাতের বায়তুয্ যিকির, মসজিদ, মিশন, লঙ্গরখানা, দপ্তর লাজনা ইমাইল্লাহ্, লন্ডন ও বার্লিন-এর মসজিদ প্রভৃতি। তিনি লঙ্গরখানার জন্য হাড়ি-পাতিল সরবরাহ করতেন। 'আল ফযল' পত্রিকার জন্য সাহায্য করতেন। মোটকথা, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে বা তাঁর (আ.) পরে এমন কোন আর্থিক তাহ্‌রীক ছিল না যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি।

হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)

হযরত আম্মাজানের জামাতা

সন্তানদের তরবিয়ত

সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে হযরত আম্মাজানের দৃষ্টান্ত ছিল অতুলনীয়। এ ব্যাপারে হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা নিজের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেন– তরবিয়তের মূলনীতির ব্যাপারে আমি অনেক লোককে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন দেখেছি। কিন্তু হযরত আম্মাজানের চেয়ে উত্তম কাউকে পাই নি। তিনি স্কুল, কলেজের শিক্ষা পান নি। বাড়িতেই উর্দূ লেখাপড়া শিখেছেন। কিন্তু আখলাক ও তরবিয়তের ব্যাপারে তাঁর যে মূলনীতি ছিল তা দেখে অবাক হতে হতো, এ সব তিনি কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে শিখেছেন! এ ব্যাপারে নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটা শুধু আল্লাহ্‌র ফযল ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর তরবিয়তের ফলশ্রুতিতেই হয়েছে। সন্তানদের আত্মিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম নীতি ছিল- শিশু সন্তানদের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে পিতামাতার আস্থার মূল্যায়ণের দায়দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা অর্থাৎ সন্তান যেন নিজ থেকে মাবাবার আস্থার মূল্য রাখে। মিথ্যাকে ঘৃণাভরে পরিহার করা, আত্মাভিমান প্রদর্শন, টাকা-পয়সা ও জাগতিক চাকচিক্যের তোয়াক্কা না করা –এ বিষয়গুলো তিনি সবচে' প্রথমে শিখাতেন। মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ও ক্ষেত্র বিশেষে আত্মাভিমান দেখানো এবং টাকা পয়সা ও পার্থিব জিনিসপত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। আর আমাদের তিনি এটাও বলতেন, শিশুদের মাঝে কোন বিষয় মেনে নেওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করে দাও। এরপর যদি তার মাঝে বাল্যকালের স্বভাবসুলভ দুষ্টামি চলে আসে তবুও সেটা কোন ব্যাপার নয়। কারণ তাকে যখনই থামাতে চাইবে তখনই থামানো যাবে। একবার যদি তুমি কথা মানার অভ্যাস সৃষ্টি করে দিতে পার তাহলে সর্বদা সংশোধনের আশা রাখতে পারবে। আমাদেরও তিনি এটাই শিখিয়েছেন। আমরা এটা চিন্তা করতে পারি না, পিতামাতার অনুপস্থিতিতে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবো। হযরত আম্মাজান সর্বদাই এটা বলতেন, আমার সন্তানরা মিথ্যা বলে না। এ আস্থাই আমাদের সব সময় মিথ্যা থেকে রক্ষা করতো, এমনকি মিথ্যার প্রতি আরো ঘৃণা সৃষ্টি করতো। তাঁর কঠোরতা প্রদর্শনের কোন ঘটনা আমার স্মরণ নেই।

তিনি এটাও বলতেন, প্রথম সন্তানের তরবিয়তের ব্যাপারে পুরো চেষ্টা-প্রচেষ্টা করো, অন্য সন্তানরা তার নমুনা দেখে নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে।

হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান সাহেব (রা.)
হযরত আম্মাজানের জামাতা

হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.) যাঁর তরবিয়ত হযরত আম্মাজানের কোলে হয়েছে তিনি বলেছেন, হযরত আম্মাজানের এটা নীতি ছিল- তিনি সন্তানদের মাগরিবের পর ঘরের বাইরে থাকতে দিতেন না। এ নীতিকে তিনি বাধ্যবাধকতার সাথে বাস্তবায়ন করতেন। এ নির্দেশ ছিল, মাগরিবের নামায পড়ে সোজা ঘরে চলে এসো, এরপর ঈশার নামায ছাড়া বাইরে যেও না। বড় হওয়া পর্যন্ত এ বাধ্যবাধকতা থাকতো। তবে হযরত আম্মাজানের তরবিয়তের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি তিরস্কার করে, ধমকিয়ে কোন কথা বলতেন না। একবার আম্মাজান কিছু শিশু কিশোরকে খাবারের জন্য ডাকলেন (এটা তাঁর রীতি ছিল)। ঐ যুগে মাটিতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার দেয়া হতো আর সবাই তাতে বসে খাবার খেত। আমাকেও বললেন- আস, সবার সাথে খাবার খাও। ঐ সময় আমি খুবই ছোট ছিলাম। তাই যেভাবে শিশুরা জিদ ধরে আমিও অল্প বয়সের দরুন না বুঝার কারণে অস্বীকার করলাম। হযরত আম্মাজান ধমকানো ছাড়াই বললেন, "ঠিক আছে খেও না, কিন্তু স্মরণ রেখ পরে আর খাবার পাবে না।" অবশেষে কিছুক্ষণ সংকোচ বোধ করার পর আমিও ঐ শিশু কিশোরদের সাথে শরীক হয়ে যাই।

হযরত আম্মাজান তরবিয়তের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও খেয়াল রাখতেন, ঘরের শিশু ও অন্যান্য এতীমরা যারা তাঁর তত্ত্বাবধানে লালিত হচ্ছে তারা যেন স্বচ্চরিত্রবান শিশুদের সাথে খেলাধুলা করে, যাতে তাদের ওপর কোন মন্দ শিশুর খারাপ অভ্যাসের প্রভাব না পড়ে। আর শিশুরা যেন মন্দ সাহচর্য থেকে দূরে থাকে। তিনি যখনই কোন শিশুর মাঝে মন্দ কোন বিষয় দেখতেন তখন এমনভাবে নসীহত করতেন যেন তার সংশোধন হয়ে যায় এবং অন্যের সামনে শুধু শুধু লজ্জাও না পায়।

হযরত আম্মাজানের হৃদয়ে শিক্ষকের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি এটা চেষ্টা করতেন শিশুদের হৃদয়ে যেন শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে এবং তারা নিজেদের শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন করে। শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী হযরত আম্মাজানের পাশে বসা ছিলেন। মিয়া সাহেব ঐ সময় খুবই ছোট ছিলেন। তিনি একটা রাবারের সাপ এনে একদম তার সামনে রেখে দিলেন। হঠাৎ সাপ দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। হযরত আম্মাজান এ অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বৌমা! এটাতো রাবারের সাপ, তুমি এমনিতেই ভয় পাচ্ছ"। আর সাথে সাথে নিজের ছেলেকে বললেন, "মিয়া মাহমুদ! উনিতো তোমার শিক্ষকের স্ত্রী। এটা তুমি কি করেছো?"

তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন,
"আম্মাজান আমার ভুল হয়ে গেছে।"

সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা

তরিবয়তের ব্যাপারে যেমন তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল তেমনি সন্তানদের প্রতিও খুবই স্নেহ-মমতা ছিল। তাদের ছোট ছোট কথাকেও তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। নিজের সন্তান ছাড়া জামাতের অপর সব শিশুকেও তিনি খুবই ভালোবাসতেন। সবাইকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন। তাদের খাইয়ে-দাইয়ে খুবই আনন্দ পেতেন। তাদের সাথে গল্প করতেন। ধাঁধা ধরতেন, ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। গল্প শুনাতেন। নিজেও খুব আগ্রহের সাথে শুনতেন। একদিন ইরফানী সাহেবের স্ত্রী যার উল্লেখ পূর্বে হয়েছে, তিনি আম্মাজানের কাছে এলেন। ঐ সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদের (রা.) অল্প বয়স ছিল। তিনি হযরত আম্মাজানের পাশে বসা ছিলেন। আর আম্মাজান সর্দার নামী সেবিকার কাছ থেকে গল্প শুনছিলেন। ইরফানী সাহেবের স্ত্রীকে দেখে সর্দার বললেন, "মিয়া এখন তাঁর কাছ থেকে শুন।' যাইহোক তিনি একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। মিয়া মাহমুদের এ গল্প খুবই পছন্দ হয়েছিল। পরবর্তী দিন যখন তিনি হযরত আম্মাজানের কাছে আসলেন তখন মিয়া মাহমুদ তাঁকে দেখে হযরত আম্মাজানের কোলে বসে বললেন, "আম্মাজান মাহমুদের আম্মা এসেছেন, তুমি তাঁকে গল্প শুনাতে বল।" আর বার বার বলতে লাগলেন। শেষে আম্মাজান বললেন, "বউ মা, তোমার কি খেয়াল হচ্ছে না, আমার ছেলে গল্প শুনতে চাচ্ছে?" তিনি বলেন, "আম্মাজান! দিনে গল্প বলা কি ভালো লাগবে?" তিনি বলেন, "না, আমরা দিনেই গল্প শুনবো।" যখন তিনি গল্প শুনাচ্ছিলেন তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এসে উপস্থিত হলেন আর বললেন, "এটা কি বলা হচ্ছে?" হযরত আম্মাজান বললেন, গল্প শুনছি। তিনি (আ.) বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা শুনাও। ছোটদের গল্প শুনালে তাদের বুদ্ধি বাড়ে।"

হযরত আম্মাজান শিশুদের ছোট ছোট কৌতুককে মন্দ আখ্যা দিতেন না। ছোট ছোট কথায় রাগ করতেন না। একবার আম্মাজানের নিকট চার বাচ্চা এলো। তিনি উঠলেন আর তাদের জন্য চালগুজা (এক রকম তরমুজ জাতীয় ফল-অনুবাদক) নিয়ে এলেন। তাদের মাঝে যে সবচে' ছোট ছিল সে খুবই দুষ্ট ছিল। সে তার নিজের বোনকে বললো, দেখ তাহেরা! চালগুজা খেয়ো না, আম্মাজান তোমাকে পেটুক মনে করবেন। হযরত আম্মাজান তার একথা শুনে খুবই হাসলেন আর বললেন, আমি তোমাকে মোটেই পেটুক ভাববো না, তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে খাও।

প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা

তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি খুবই ভালোবাসা ছিল। বিশেষভাবে নিজের ভাই ও তাদের সন্তানদের প্রতি খুবই ভালোবাসা ছিল। নিজের বউদের মেয়ের মত ভালোবাসতেন ও তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। সবার প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতেন। আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের পছন্দমত খাবার রান্না করে খাওয়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল। প্রত্যেক ঈদে সবাই তাঁর মেহমান হতো। শেষ জীবন পর্যন্ত সবাইকে দাওয়াত করেছেন। এমনকি শেষের দিকে যখন তাঁর অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেল তখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে ডেকে বললেন, "আমার শরীর এখন খুবই দুর্বল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে খান্দানের লোকদের দাওয়াতের ব্যবস্থা কর। কেননা, এখন এটা আমার নিজের দ্বারা হচ্ছে না।" সুতরাং মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

হযরত ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বলেছেন, হযরত আম্মাজানের নিজের ভাইদের কষ্ট খুবই অনুভূত হতো। যখন আমাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও জামাতের অন্যান্য সদস্যগণ আমার ইচ্ছা অনুযায়ী ডাক্তারী পড়ার পরামর্শ দেন। তখন আর্থিক সমস্যার কারণে আমি অসুবিধায় পড়ে গেলাম ও নিরাশ হয়ে গেলাম, এখন আমার ভর্তি সম্ভব হবে না। যখন আম্মাজান এটা অবগত হলেন তখন তাৎক্ষণিক বললেন, "তুমি সাহস ও দৃঢ় মনোবলের সাথে পড়তে যাও। আমি আমার নিজের খরচ থেকে তোমাকে টাকা দিবো। কেউ তা জানতে পারবে না। এমন কি হুযূর (আ.)ও এটা জানবেন না। এ কথা তিনি এজন্য বলেছেন যাতে মীর সাহেবের আত্মসম্মানবোধে আঘাত না লাগে। আর এভাবে আল্লাহ তা'লার ফযলে মীর সাহেব তাঁর যুগের একজন বড় ও প্রসিদ্ধ সার্জন হয়েছেন।

বউদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর বড় বউ হযরত উম্মে নাসের সাহেবা বলেন, আমার বয়স বিয়ের সময় ১১ (এগার) বছর ছিল। প্রথম দিন আম্মাজান আমাকে তাঁর নিজের সাথে ঘুম পাড়ালেন। আর বললেন, "ও তো বাচ্চা, ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে।" পরেও তিনি আমাকে অনেক স্নেহ-মমতা দিয়েছেন। আমার অনেক খেয়াল রেখেছেন। কিছুদিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাঁর ভালোবাসা এতোই বেড়ে গেল, আমি বাপের বাড়ির কথা ভুলেই গেলাম। যেন

খোদা আমাকে এক মায়ের কোল থেকে বের করে অন্য মায়ের স্নেহ-মমতা ভরা কোলে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার চিত্রটি হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'তিনি সর্বোত্তম মা ছিলেন। তাঁর হৃদয় স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সন্তানদের ছোট ছোট বিষয়েরও খেয়াল রেখেছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ছোটবেলায় হাওয়াই মিঠাই যা পাঞ্জাবে "মাঈ বুড্‌ঢিদা ঝাটা" বলা হতো তা খুবই পছন্দ ছিল। তিনি যখনই কোন শিশুকে এটা খেতে দেখতেন তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়ে এটা আনাতেন। আর বলতেন যাও, মিয়া মাহমুদকে দিয়ে আস। তার এটা খুবই পছন্দ। এভাবে সর্বদাই তাঁর খাবারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। এমনিভাবে যদি কোন জিনিস যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পছন্দ তা প্রস্তুত হতো তাহলে বলতেন এটা আমার "বুশরার" পছন্দ। কেউ গিয়ে তাকে দিয়ে আস। তাঁর অন্তিম অসুস্থতার দিনগুলোতে যখন অধিকাংশ সময় নিদ্রাবস্থায় থাকতেন সে সময়ও সন্তানদের খেয়াল রেখেছেন। একদিন মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব মনে করেন, যিনি ঐ সময় অসুস্থতার কারণে লাহোরে ছিলেন। আমাকে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন শরীফকে চা পান করাও যাতে তার মাথা ব্যথা না হয়।'

হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা বর্ণনা করেন, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি আম্মাজানের এতো ভালোবাসা পেয়েছি, নিজের কষ্টকে ভুলে গেলাম। এমন মনে হয়েছে, আমি দ্বিতীয়বার মায়ের কোলে ফেরত এসেছি। যখন দেশ বিভাগ হলো আর আমরা কাদিয়ান থেকে লাহোর আসলাম, তখন কারও আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। একবার আমি বাজারে গেলাম। একটা কাপড় খুবই পছন্দ হলো, কিন্তু নিতে পারলাম না। ফেরত আসার পর কথা প্রসঙ্গে আম্মাজান অবগত হলেন আর বলেন, "কোন দোকানে দেখেছ? কি রং ছিল?" সাধারণ কথাবার্তাই হচ্ছিল কিন্তু পরের দিন কি দেখলাম! ঐ কাপড়ের টুকরা আম্মাজান নিয়ে এসেছেন। আর বললেন, "এটা ধর আর সেলাই করে পড়। কাল থেকে আমার ঘুম হচ্ছিল না, আমার মেয়ে হৃদয়ে কষ্ট নিয়ে খালি হাতে ফেরত চলে এসেছে।" মোট কথা হযরত আম্মাজানের নিজের সন্তানদের ছোট থেকে ছোট ইচ্ছার প্রতিও খেয়াল থাকতো। আর সন্তানের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করতেন।

এতীমদের প্রতি খেয়াল

সাধারণভাবে হযরত আম্মাজান সব এতীমের খেয়াল রাখতেন কিন্তু বিশেষভাবে তিনি যেসব এতীম মেয়েদের নিজে লালন-পালন করতেন তাদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার সম্পর্ক ছিল। তিনি তাদের নিজের সন্তানদের মত শিক্ষাদীক্ষা দিতেন। তিনি নিজে তাদের গোসল করাতেন, মাথায় দই লাগাতেন, তেল দিতেন যাতে মাথায় খুসকি না হয়। আর এ কাজ করার সময় তাঁর চেহারায় খুশির ছাপ ফুটে উঠতো। যখন শিশু বুঝার যোগ্য হতো তখন তাকে সর্ব প্রথম কলেমা, এরপর নামায অর্থসহ শিখাতেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা তিনি নিজে দিতেন। পরে কোন শিক্ষক নিয়োগ করে কুরআন শরীফ পড়া শিখাতেন। খাবার রান্না করা, কাপড় সেলাই করা শিখাতেন। আমেনা নেক মুহাম্মদ সাহেবাকেও তিনি নিজে লালন-পালন করেছেন ও সবকিছু শিখিয়েছেন। স্কুলেও পাঠিয়েছেন যাতে জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে নেন। তদুপরি তার কাছ থেকে ছোট ছোট গল্পের বই পড়া শুনতেন যেন তাঁর উর্দু শুদ্ধভাবে বলা রপ্ত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়া শুনতেন। আর এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। তাদের তরবিয়তও করতেন। সাথে সাথে ছোট ছোট খুশির প্রতিও খেয়াল রাখতেন। আবার ঐ সব মেয়েদের নিজেই বিয়ে দিতেন।

একটা ঘটনা, একবার হযরত আম্মাজান ছোট এক গ্রামের দিকে ভ্রমণে গেলেন। সাথে দু'জন সেবিকা ইমাবী ও মায়ীফজ্জু ছিলেন। যখন তিনি গ্রামের এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন একটা মেয়ে একটা ময়লা কাপড়ের টুকরার উপর শুয়ে আছে। আর বাঙ্গির একটা ময়লা খোসা মুখে দিচ্ছে। তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কে?' গ্রামের কয়েকজন লোক বলল, 'ও' একটা এতীম এবং বোবা ও বধির মেয়ে। তিনি এক সেবিকাকে আদেশ দিলেন, ওকে এভাবেই নিয়ে চল। তার বয়স ৬/৭ বছর হবে। তাকে কাদিয়ানে নিয়ে আসলেন আর সোজা মেয়েদের স্কুলে গিয়ে উঠলেন। যেটা ঐ সময় 'দারুল মসীহ'-তে হতো। এ মেয়ের চেহারা এমন ভীতিকর ছিল যে সেখানকার অন্যান্য সব মেয়েরা তাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। আর চিৎকার করে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। আম্মাজান তাদের অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন আর বললেন, "ও' এক এতীম ও বেওয়ারিশ শিশু, ওকে তোমরা মানুষ বানাবে, ওর নাম হিমী।" এরপর নিজেই গিয়ে ফিনাইল, চিরুনী, তেল, দামী জামা-কাপড়, জুতা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসলেন। আর শিক্ষিকা মায়মুনা সাহেবাকে বলে তাকে

গোসল করালেন, পরিষ্কার কাপড় পরালেন। চুল পরিপাটি করালেন। পরে খাবার খাওয়ালেন। কিছু দিনের মধ্যে এ বাচ্চা আম্মাজানের দেখাশুনা ও খোদার ফযলে পশু থেকে মানুষে পরিণত হয়ে গেল। তিন চার দিন পর আম্মাজান নিজেই তাকে গোসল করাতেন, উকুন বেছে দিতেন, চুল পরিপাটি করে দিতেন, যেন সে তাঁরই সন্তান। বাচ্চাদের মাঝে থাকতে থাকতে তার এতটুকু বুদ্ধি হল, সে ঘরের কাজকর্ম করা শিখে গেল। যখন সে বিয়ের বয়সে উপনীত হল তখন আম্মাজান নিজ হাতে তাকে বিয়ে দিলেন।

সেবকদের সাথে উত্তম ব্যবহার

নিজের সেবকদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করতেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও খুবই খেয়াল রাখতেন। দু:খ কষ্টের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতেন। এক বার কোন এক মহিলা অনুরোধ করলেন, অমুক সেবিকা বলেছে তার রুটি কম হয়েছে। তিনি বাবুর্চিখানা থেকে তার জন্য রুটি আনালেন আর তাতে আরো কিছু তরকারী ঢেলে দিলেন। আরো দু'টি অতিরিক্ত রুটি আনিয়ে তার রুটির সাথে মিলালেন। আর নিজের তোয়ালের মাঝে ভাঁজ করে রেখে দিলেন এবং বললেন, "সে বাচ্চার মা, তাকে কম রুটি দিও না।" আর যখন ওই সেবিকা আসলো তখন তাকে খুশী করার জন্য বললেন, "দেখ, আমি তোমার রুটিগুলো নিজের তোয়ালের মধ্যে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি যেন কম না হয়।"

অভাবীদের সাহায্য

আব্দুর রহিম সুরমা সাহেব নিজের একটা ঘটনা শুনিয়েছেন–

"হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব আমাকে থাকার জন্য নিজ বাড়ীর একটা কামরা দিলেন। ঐ সময় আমার পরিবারে পাঁচ সদস্য ছিল। আর বেতনও খুবই কম ছিল। জীবিকা নির্বাহ খুবই কষ্টে হতো। যখন হযরত আম্মাজান আমাদের ঐ দারিদ্রতার কথা জানতে পারেন, আমরা পুরো পরিবার (আধ) সের দুধ দ্বারা জীবন ধারণ করে যাচ্ছি; তখন তাঁর অসীম দয়া জাগে। আর তিনি নিজের একটি গাভী আমাদের দিয়ে দেন। ঐ গাভীটা উৎকৃষ্ট জাতের ছিল। ৭/৮ সের দুধ দিত। এ গাভী ঘরে আসার পর এতোই বরকত হলো, কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল।"

নিজের কাজ নিজ হাতে করা

হযরত আম্মাজানের কঠোর পরিশ্রম করার অভ্যাস ছিল। ছোট থেকে ছোট কাজও তিনি নিজের হাতে করতে পছন্দ করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন–

"আমি নিজের চোখে তাঁকে অনেকবার খাবার রান্না করতে, চরকায় সুতা কাটতে, ফিতা বানাতে, এমনকি মেষগুলোকে খাবার দিতেও দেখেছি। অনেক সময় নিজে মেথরদের সাথে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাতেন, আর পিছনে দাঁড়িয়ে বদনা দিয়ে পানি ঢালতেন। কাদিয়ান থেকে আসার পর নিজে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কাজ নিজেই করতেন। বাক্স থেকে জিনিসপত্র নিজে বের করতেন ও রাখতেন। কেউ চুলায় তরকারী বসালে নিজেই বসে চামচ দিয়ে তা নাড়তেন। সাহায্য নেয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। চলার সময় দুর্বলতার কারণে কেউ ধরতে গেলে তিনি বলতেন, "আমি নিজেই চলবো। সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"

তিনি শুধু নিজের কাজই নিজে করতেন না, বরং অন্যদের কাজেও সহযোগিতা করতেন। এটা তাঁর অভ্যাস ছিল। চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা আমেনা বেগম সাহেবা বলেন, একবার আম্মাজান আমাদের ঘরে এলেন। আমার মা দুধ ঘোটছিলেন। আমার ছোট ভাই কাঁদছিলো। আম্মাজান অত্যন্ত স্নেহের সাথে বললেন, "উঠে শিশুকে কোলে নাও।" আর নিজেই বসে দুধ ঘোটতে লেগে গেলেন। নিজেই মাখন পৃথক করলেন। এরপর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হযরত আম্মাজান রুটীনানুসারে এ কাজ করেছেন। বেহেশতী মাকবেরায় যাওয়ার সময় কোন না কোন মহিলাকে আমাদের ঘরে রেখে যেতেন, যে দুধ ঘোটা ও অন্যান্য কাজ করতো। আর যাবার সময় তাকে সাথে নিয়ে যেতেন।

স্বনির্ভরতা ও আত্মত্যাগ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মৃত্যুবরণ করেন, তখন আমাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের কোন দ্রব্যসামগ্রী ছিল না। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ঐ সময় কিছু ঋণও ছিল। হযরত আম্মাজান জামাতকে সেটা আদায় করার জন্য বলেন নি বরং নিজের কাছে যে অলংকারাদি ছিল তা বিক্রি করে হুযূরের (আ.) ঋণ আদায় করেন। আমি সে

সময় ছোট ছিলাম। তাই তাঁর খেদমত (সেবা) করার আমার কোন সুযোগ হয় নি। কিন্তু আমার হৃদয়ে সব সময়ই এটা অনুভব হতো, আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে কতই না প্রেমময়ী ও আত্ম-নিবেদিত জীবনসঙ্গিনী দিয়েছিলেন।

শির্‌কের প্রতি ঘৃণা

শির্‌কের প্রতি হযরত আম্মাজানের প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। দু'তিনটি ঘটনা তোমাদের শুনাবো।

একবার কোন এক মহিলা তার কোন অসুস্থ আত্মীয়ের কথা শুনাচ্ছিল। শেষে বললো, "কোন চিকিৎসায় উপকার হচ্ছিল না, কিন্তু অমুক ঔষুধে এখন আরামবোধ করছে।" হযরত আম্মাজান খুবই জোশের সাথে বললেন, "তুমি এটা কেন বলছো না, ঐ তদবীরের (উপায়-উপকরণ) সাথে খোদার ইচ্ছা শামিল ছিল, আর এখন এর ফলে আরামবোধ হচ্ছে।"

আর একবার কী হলো! এক মহিলা আম্মাজানের সেবায় একটি পেয়ালা পেশ করলো। এর উপর কিছু লেখা ছিল আর বললো, এতে পানি ঢেলে পান করে নিবেন। তিনি থামিয়ে দিলেন আর বললেন, "আমি এমনটি করবো না, এটা শিরক।"

এক মহিলা প্রতিদিন রেডিওতে খবর শুনে আম্মাজানকে শুনাতেন। একদিন কোন সংবাদ শুনে বললেন– কৃতজ্ঞতা আদায় করি রেডিও আবিষ্কারকের, কেমন ভালো জিনিস আবিষ্কার করেছে। ঘরে বসে সারা বিশ্বের খবর শুনছি। শব্দ শুনছি।

তখন হযরত আম্মাজান অবলিলায় বললেন, আমার খোদা কত মহিয়ান! তিনি মানুষকে এতই জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, সে এমন জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে।

হযরত আম্মাজানের আতিথেয়তা

হযরত আম্মাজান মেহমানদারীতে অভ্যস্ত ছিলেন। যে-ই ঘরে আসতো তিনি তাকে আপ্যায়ন করতেন। মেহমানদের খেয়াল রাখতেন ও তাদের প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করতেন। চৌধুরী ফাতাহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব যখন প্রথম কাদিয়ানে আসেন তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তেন। ঐ সময়

হযরত আম্মাজান বিশেষভাবে মেহমানদারী করতেন। সব মেহমান মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে গোল কামরায় খাবার খেত। প্রথম দিন যখন চৌধুরী সাহেব খাবার খেলেন তখন খাওয়া-দাওয়ার পরে হযরত আম্মাজান কোন ব্যক্তিকে বলে পাঠালেন, কোন মেহমানের বিশেষ কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি যেন তা বলেন। চৌধুরী সাহেব নি:সংকোচে বলে দিলেন, "আমার লাচ্ছির অভ্যাস।" কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি লাচ্ছি এসে গেল। অন্য বন্ধুরাও তা খেল। অন্যরা চা, পান ও অন্য জিনিস চেয়ে নিল।

প্রফুল্লচিত্ততা

হযরত আম্মাজান অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। হালকা-পাতলা কৌতুক তিনি পছন্দ করতেন। পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা তাঁর খুবই পছন্দ ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে তিনি পায়ে হেঁটে ভ্রমণে যেতেন। পরেও এমনই করতেন। পিকনিকও করতেন। একবার তিনি নিজের বাগানে আলু লাগালেন আর হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা, সাহেবযাদী আমাতুল হাফিয সাহেবা, অন্য মেয়েরা ও বউদের নিয়ে বাগানে ভ্রমণে গেলেন। দুই ঝুড়ি আলু সিদ্ধ করে এর সাথে আচার রাখলেন আর নিজের বাগানের 'লুকাট' (এক ধরনের ফল) তুললেন। চাটনী বানালেন। মাটিতে কার্পেট বিছিয়ে সবাই খেলেন। মেয়েরা দোলনাতে ঝুলতে থাকে, খেলতে শুরু করে। সবাই খুবই মজা করে।

একবার হেঁটে ইরফানী সাহেবের ঘরে যান। তাঁর ঘর পুকুর পাড়ে ছিল। হযরত আম্মাজান সেখানে বাচ্চাদের একত্র করে বললেন, সোনামণিরা! আমাকে তোমরা সাঁতার কেটে দেখাও। পুকুর পাড়ে এক গাছের নিচে নিজের খাট বসালেন। আর সেখানে বসে শিশুদের সাঁতারকাটা দেখতে লাগলেন। খাবারও সবাই ঐ পুকুর পাড়ে খেলেন।

তিনি রসিকতাও করতেন। এক মহিলা যাকে সবাই আসগরীর মা বলে ডাকতো তিনি আম্মাজানের খাবার রান্না করতেন। তার অভ্যাস ছিল হাড়িতে চামচ নাড়াতে থাকতেন আর সাথে সাথে দোয়া করতে থাকতেন, হে আল্লাহ্! সমগ্র জগতের খাবারের স্বাদ যেন আমার হযরত সাহেবের খাবারের মধ্যে এসে যায়। আম্মাজান একদিন হেসে বললেন, "কী আসগরীর মা! আমার ভাইয়ের খাবারেরও কি?" (অর্থাৎ হযরত ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব যিনি ঐ সময় লাহোরে পড়তেন।) আসগরীর মা তাৎক্ষণিক বললেন, "হ্যাঁ আল্লাহ্ মিয়া! ঠিক আছে! মিয়া ইসমাঈলের খাবারের স্বাদ যেন না আসে।"

জ্ঞানের মূল্যায়ন ও সাহিত্যিক রুচিবোধ

হযরত আম্মাজান জ্ঞানের খুবই মূল্যায়ন করতেন। এ কারণে তিনি শিক্ষকদের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। শিক্ষিকা মোহতরমা সাকিনা সাহেবা বলেন, "সাহেবযাদী আমাতুল হাফিয সাহেবার যখন ৫/৬ বছর বয়স, তখন আম্মাজান তাঁকে পড়ানোর জন্য আমাকে নিয়োগ করেন। আমি তাঁকে উর্দূ লেখাপড়া শিখানো শুরু করি। ঐ সময় হযরত আম্মাজান আমার উপর খুবই অনুগ্রহ করেছেন। আমার জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনকে পূর্ণ করেছেন। ফলে আমার সমস্ত চিন্তা দূর হতে লাগলো। আর যখন সাহেবযাদী সাহেবার বিয়ে হলো তখন তিনি আমাকে তাঁর পাশেই একটা জমি দিলেন যেন বাড়ি বানাই।

হযরত আম্মাজান জ্ঞানের অন্বেষণ করতেন আর এ কারণে খোদা তা'লাও তাঁকে জ্ঞান দান করেছিলেন। যখনই কেউ কোন ধরনের আপত্তি করতো তখন তিনি (ধর্মীয়) শিক্ষা অনুসারে দলিল দিয়ে এর উত্তর দিতেন। বেগম শেঠ আব্দুল্লাহ্ ভাই বলেন, "একবার আমরা কয়েক বোন হযরত আম্মাজানের পাশে বসা ছিলাম। আমি কাপড়ের কয়েকটি পুতুল দেখি। শিশুদের খেলার জন্য এগুলো রাখা হয়েছিল। আমি নিবেদন করলাম, কাপড়ের পুতুল কেন রাখা হলো? ধর্মে তো এটা নিষেধ করা হয়েছে।" তিনি কিছু মনে না করে উত্তর দিলেন, "প্রকৃত কথা হলো ধর্ম সেটাকে নিষেধ করেছে যেটাকে হিন্দুরা মূর্তি বানিয়ে খুবই সম্মান করে ঘরে রাখে। তারা এটির প্রতি খোদার গুণাবলী আরোপ করে ইবাদত করে। এ কারণে, আল্লাহ তা'লা এ শিরককে বন্ধ করার জন্য মূর্তি বানানো নিষেধ করেছেন। আরবের লোকেরাও জাহেলিয়াতের (অন্ধকারের) যুগে মূর্তির ইবাদত করতো। এ কারণে আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়টিকে দূর করার জন্য মূর্তি বানানো ও রাখা নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের খেলনাকে তিনি বন্ধ করেন নি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পুতুল দিয়ে খেলা করতেন। তবে এমন কোন জিনিস যেটির প্রতি আল্লাহ্‌র গুণাবলী আরোপ করে ইবাদত করা হয়, সেটি ঘরে রাখা অত্যন্ত গুনাহ্ ও শিরকের কাজ।"

ঐ মহিলা আবার বলেন, "পুনরায় আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও জামাতের অন্যান্য সদস্যদের ছবি দেখে আপত্তি করি। হযরত আম্মাজান এরও উত্তর এভাবে দেন, হুযূর (আ.)-এর ছবি ইবাদতের জন্য নয় বা পূজার জন্যও নয়। বরং এটা এজন্য যে যারা দূর-দূরান্তের দেশে থাকে তারা যেন নিজের ইমামের চেহারা এভাবে দেখে নেয়। যা কিনা হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী করা হয়েছে। আর ইংল্যান্ড ও অন্যান্য পশ্চিমা বিশ্বের

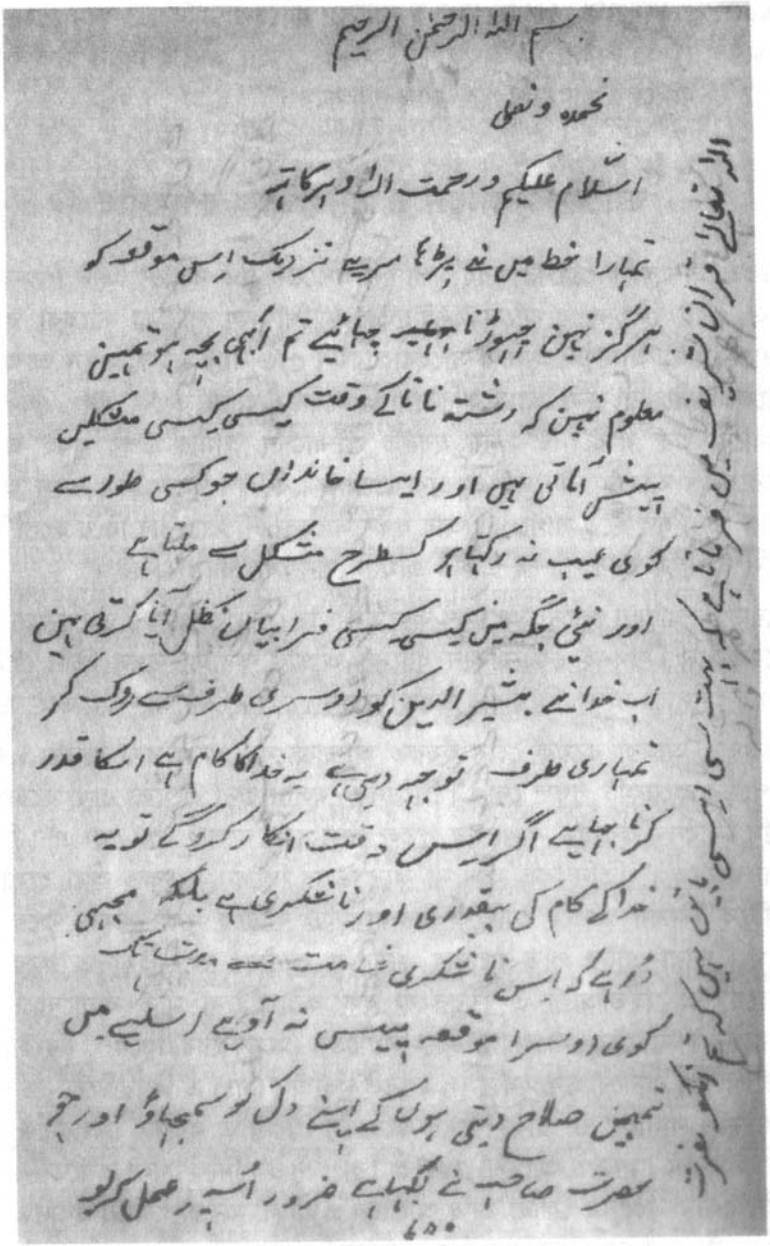

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

تمہارا خط میں نے پڑھا میرے نزدیک اس موقعہ کو
ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے تم ابھی بچہ ہو تمہیں
معلوم نہیں کہ رشتہ ناتا کے وقت کیسی کیسی مشکلیں
پیش آتی ہیں اور ایسا خاندان جو کسی طور سے
کوئی عیب نہ رکھتا ہو کس طرح مشکل سے ملتا ہے
اور نئی جگہ میں کیسی کیسی خرابیاں نکل آیا کرتی ہیں
اب خدا نے بشیر الدین کو دوسری طرف سے روک کر
تمہاری طرف توجہ دی ہے یہ خدا کا کام ہے اسکا قدر
کرنا چاہیے اگر اس وقت انکار کرو گے تو یہ
خدا کے کام کی بےقدری اور ناشکری ہے بلکہ مجھے بھی
[illegible]
ڈر ہے کہ اس ناشکری سے
کوئی دوسرا موقعہ پیش نہ آوے اسلیے میں
تمہیں صلاح دیتی ہوں کہ اپنے دل کو سمجھاؤ اور جو
حضرت صاحب نے لکھا ہے ضرور اسپر عمل کرلو

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے [illegible]

হযরত আম্মাজানের হাতে লেখা চিঠি

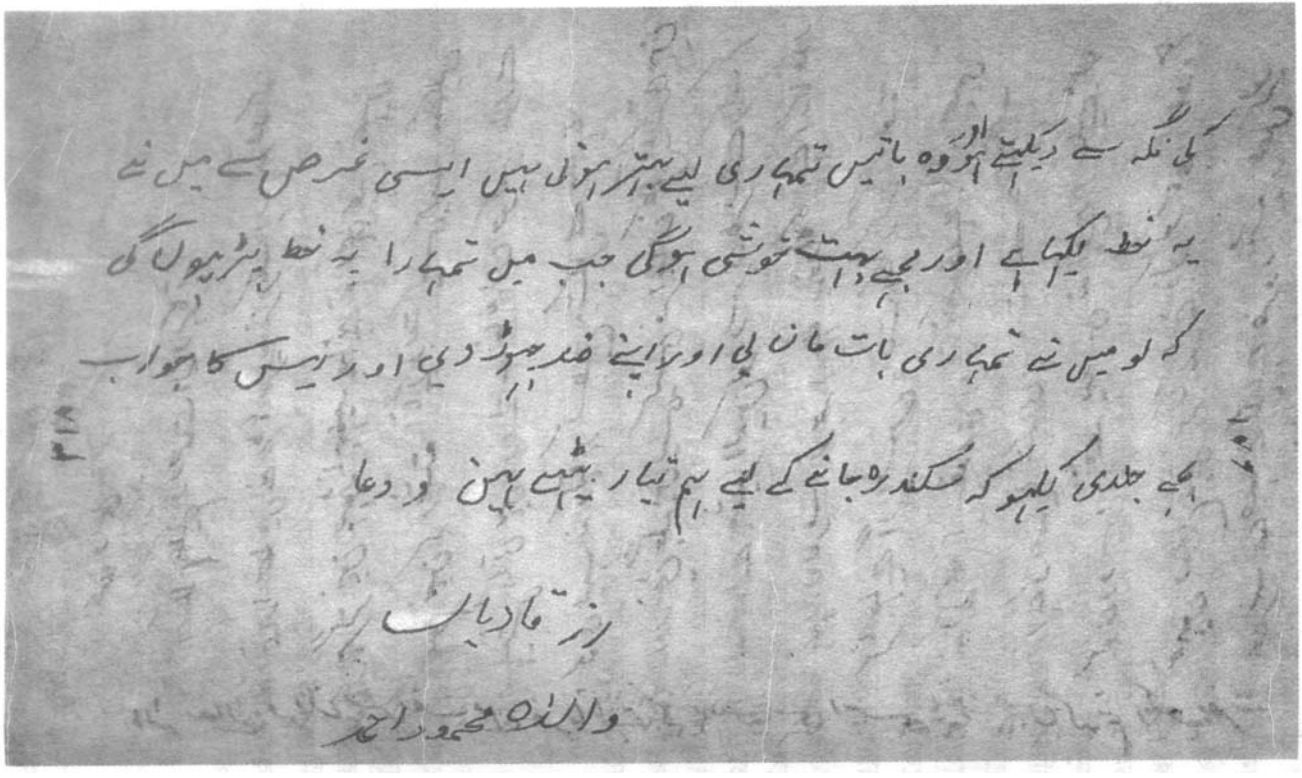

کی نگہ سے دیکھتے ہو وہ باتیں تمہاری لیے بہتر ہونی ہیں ایسی غرض سے میں نے
یہ خط لکھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہارا یہ خط پڑھوں گی
کہ لو میں نے تمہاری بات مان لی اور اپنے ضد چھوڑ دی اور ریس کا جواب
مجھے جلدی لکھو کہ سکندرہ جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں فقط دعا

زرقادیان

والدہ محمود احمد

লোকেরা ছবি দেখে কোন ব্যক্তির চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য জিনিস অনুমান করে নিতে পারে। এ ছবি তো নিজেই দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র একটা মাধ্যম। যদি শুধু ছবি রাখা নিষেধ হতো তাহলে তুমি পকেটে যে টাকা রাখ, বাচ্চাদের বইয়ে যে ছবি রয়েছে সবই নিষিদ্ধ হতো। আমি বললাম, এ কথা থেকে ছবির মাসলা (সমস্যা সমাধান) আমার বোধগম্য হয়ে গেল।"

তৃতীয় ঘটনা যা তিনি শুনান, একবার আমি লক্ষ্য করি কিছু মহিলা নিজেদের চুলে টারসেল লাগিয়ে চুলের খোঁপা বাড়িয়ে থাকে। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "এটা তো রেশমের টারসেল, (আসল) চুলের নয়। এটা লাগানো জায়েয (বৈধ)। রসূল (সা.)-এর যুগে যালেমরা মেয়েদের উপর বড় যুলুম করতো। তাদের চুল জোর জবরদস্তি করে কেটে বিক্রি করে দিত। এ জন্য রসূল (সা.) নিষেধ করেছেন, মেয়েদের চুলের মধ্যে যেন চুল না লাগানো হয়।"

সাহিতের রসবোধ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যদি কোন উর্দূ শব্দের কোন বিশেষ ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাইতেন, তাহলে তিনি তা সর্বপ্রথম হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করতেন। এরপর যদি কোন সন্দেহ থাকতো তাহলে তিনি তা নানাজান বা নানীজানকে জিজ্ঞেস করতেন। আম্মাজান কখনো কখনো কবিতা বলতেন। একবার হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা যখন মালিরকোটলা ছিলেন তখন ঈদ উপলক্ষে তাঁকে এ কবিতা লিখে পাঠান–

"তুমি আছ মহা সুখে নিজ ঘরে
সব চিন্তা মুক্ত হয়ে, পরে থেকে দূরে।
আপন সন্তান কোলে হাসে খেলে যার
খোদার ফযলে এটা হয় ঈদ, সবচে' বড় ঈদ তাঁর
তুমি একথা ভুলে আছ বহু দূরে,
তাই বুঝ না, সন্তানশূন্য মায়ের হৃদয়ের দু:খটারে।"

একবার হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর এক ছাত্র যার নাম ছিল মৌলভী নিজাম উদ্দিন। ঘর থেকে যে রুটি বানিয়ে পাঠানো হতো সে রুটির বিষয়ে একবার একটি কাগজে নিম্নলিখিত অভিযোগ লিখে পাঠায়।

যদি রুটি এই বুড়ি পাকায়,
ফিরিয়ে দাও তা যেন সব ঘরে রয়ে যায়।
এ কেবল আবেদন করা জরুরী।
রুটি যেন হয় পরিষ্কার ও তন্দুরী।

এ দুই পংক্তি অসম্পূর্ণ ছিল। তবুও যা সে পেরেছে তা লিখেই পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হযরত আম্মাজান ঐ সময়েই কাগজের অপর পৃষ্ঠায় এ পংক্তি লিখে পাঠান–

আমাদের তো এই বুড়ি গনিমত,
যে রুটি পাকিয়ে দেয় সময়মত
বুড়ির হাত যে নাহি পছন্দ করে,
তো সে এনে দিক তাকে যে ভালো রান্না করতে পারে।

নেকী অর্জনের আগ্রহ

ছোট ছোট কাজ যা করলে পুণ্য হয় তা হযরত আম্মাজান অবশ্যই করতেন। একবার হযরত আম্মাজান বায়তুদ দোয়ায় নামায পড়ছিলেন। পাশেই এক মহিলা বসে পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছিলেন। যখন আম্মাজান নামায শেষ করলেন তখন তিনিও সেখানে নামায পড়া শুরু করলেন। হযরত আম্মাজান পাখা হাতে নিয়ে বাতাস করা শুরু করে দিলেন। ঐ মহিলা ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলেন যাতে বেয়াদবী না হয়। আর তওবা তওবা করতে লাগলেন। হযরত আম্মাজান এটা শুনে বললেন,

"আমি কি নেকী অর্জন করবো না?"

সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন

হযরত আম্মাজানের জমি শেখ নূর আহমদ সাহেব দেখাশুনা করতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁকে ডেকে খবর নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, অমুক ক্ষেতে জোয়ারের মাঝে ঘাস কেন? এটাকে গম চাষের জন্য ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। যে গবাদিপশু পালন করা হতো এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতেন। একবার এক মহিষকে দুই তিন দিন ঘাস দেয়া হয় নি। তখন আম্মাজান নিজে গিয়েই ঘাস দেন।

তিনি হিসেব-নিকেশে খুবই পরিষ্কার ছিলেন। অর্থাৎ যখনই তিনি কোন জিনিস আনাতেন তখনই এর দাম পরিশোধ করতেন। একবার হযরত আম্মাজান বাবু আব্দুল হামিদ সাহেবকে দিয়ে লাহোর থেকে কোন জিনিস আনান। তিনি ঐ জিনিস এনে আম্মাজানকে দেন কিন্তু দাম বলেন নি। ঘটনাক্রমে হযরত আম্মাজানের দাম জিজ্ঞেস করতে স্মরণ ছিল না, নতুবা সাধারণভাবে তাঁর রীতি ছিল যখনই কোন জিনিস তাকে এনে দেয়া হতো তিনি তখনই এর দাম দিয়ে দিতেন। পরে তাঁর স্মরণ হলে তখনই বাবু সাহেবকে ডেকে আনান আর বলেন, "এই জিনিসের দাম কত? যদি বলে যেতেন তাহলে আমি আপনাকে না ডেকেই

এর দাম পাঠিয়ে দিতাম।" বাবু সাহেব বললেন, "এটা তো আমার পক্ষ থেকে তোহ্ফা। আমি জেনে বুঝেই দাম বলিনি।" আম্মাজান বললেন, "না, যে জিনিস আমি বলে আনাব সে জিনিসের দাম অবশ্যই নিতে হবে।" আর তিনি জোর করে দাম পরিশোধ করে দেন।

জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন

সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের শৈশব থেকে শিকারের প্রতি ঝোঁক ছিল। হাকীম আব্দুল আযীয খানও এর প্রতি ঝোঁক রাখতেন। আর অধিকাংশ সময় তিনি তাঁকে নিজের সাথে শিকারে নিতেন। একটা ঘটনা, তখন মে মাস ছিল। হাকীম সাহেব মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবকে বলেন–

"মিয়া বন্দুক নিয়ে শিকারে চল।"

মিয়া সাহেব খুবই খুশী হয়ে বন্দুক আনতে যান। ফেরত এসে বলেন, "আম্মাজান বন্দুক দিচ্ছেন না।" এতে খান সাহেব নিজেই বলে পাঠালেন, কিছু সময়ের জন্য বন্দুক দেয়া হোক। তিনি উত্তরে বললেন, "এখন পাখিদের ডিমে তা দেয়ার সময়। আমিও সন্তানের মা। আমি এ সময়ে বন্দুক কিছুতেই দিব না।"

উদারতা প্রদর্শন

ক্ষমা করে দেয়া আম্মাজানের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট বিষয় হোক বা বড় বিষয় হোক আর এমন কোন বিষয় যা তাঁকে কষ্ট দিত বা ক্ষতি করতো তাতে তিনি উদারতা দেখাতেন। আরশাদ কুরাইশী সাহেব একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনাতেন, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন হযরত আম্মাজানের ঘরে আসা-যাওয়া করতাম। একবার গিয়ে দেখলাম, তিনি কোলে তাঁর নাতি হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেবকে নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এ ছেলেকে একটু বাইরে নিয়ে যাও।" বাহির বলতে হয়তো তিনি বাড়ির উঠানকে বুঝিয়েছেন। আমি মনে করেছি ঘর থেকে বাহিরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা। আমি কচি শিশুকে কোলে তুলে খুশি হয়ে বাগানে নিয়ে যাই। ঠান্ডা বাতাসে খেলা করে যখন ফেরত আসলাম তখন দেখলাম পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বাগানে আসছেন। আমাকে দেখে তিনি শান্ত হলেন আর বললেন, "তুমি শিশুকে নিয়ে কোথায় ঘুরছো। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। সব জায়গায় খোঁজা হয়ে গেছে।" এটা শুনে আমি খুবই দ্রুততার সাথে চলি। কেননা ঘরে শিশুকে না দেখে আমার সন্ধান করা শুরু হয়ে গিয়েছিল সে না আবার কোথায় হারিয়ে গেছে। কিছু মহিলা ও পুরুষ এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আমি ভয়ে ভয়ে ঘরে প্রবেশ করি।

জানি না আমার সাথে কি ব্যবহার করা হয়, এ ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। কিন্তু হযরত আম্মাজানের উপর দৃষ্টি পড়তেই আমার ভয় দূর হয়ে গেল। হৃদয় প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হয়ে গেল। তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা ধমক দেয়ার পরিবর্তে হাসতে হাসতে বললেন, তাকে এতো দূর কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন? আমি তো বাহিরের উঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম।

ঘরে যদি কোন কাজের মেয়ে কোন ক্ষতি করে ফেলতো বা কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেলতো তা হলে তিনি 'ইন্নালিল্লাহি' পড়ে চুপ থাকতেন। তিনি জোর জবরদস্তির চেয়ে উদারতা দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা উত্তম মনে করতেন।

পরনিন্দা ও পরচর্চার প্রতি ঘৃণা

হযরত আম্মাজান পরনিন্দা ও পরচর্চার বা কারো অনুপস্থিতিতে অভিযোগ করাকে খারাপ মনে করতেন। এ বিষয়টি তাঁর অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল। এক মহিলা ছিল যার মাঝে এ দুর্বলতা ছিল। তিনি তাকে বুঝালেন এ বিষয়টি ভালো নয়। আল্লাহ তা'লা নিষেধ করেছেন। এ মহিলা শুনে তাৎক্ষণিক বললো, "আপনাকে অমুক মহিলা হয়তো বলেছে আমি এমন করি।" আম্মাজান এ কথা শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন আর বললেন, "তুমি অযথাই কুধারণা করছো।"

দোয়ার কবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা)

সোনামণিরা! যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি, হযরত আম্মাজানের দোয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একইভাবে তিনি প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কাজের জন্য দোয়া করতেন। আর আল্লাহ তা'লাও তাঁর দোয়া খুবই শুনতেন।

এ সম্পর্কে এখন তোমাদের একটা ঘটনা শুনাবো। মিয়া আল্লাহ্‌রাখ্‌খা নামে মাড়িবুছিয়া গ্রামে এক আহমদী দোকানদার ছিলেন। তিনি গ্রাম থেকে সবজি ক্রয় করে আশপাশের বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন। একদিন তিনি কাদিয়ানে আসেন। তাঁর ঘোড়া নিজে নিজেই রশি খুলে পালিয়ে যায় অথবা আল্লাহ্-ই জানেন কোন চোর খুলে নিয়েছিল কিনা? ঐ বেচারা খুবই অস্থির হয়ে গেলেন। কাদিয়ান ও এর আশপাশের সব গ্রামে খোঁজ করলেন। কিন্তু ঘোড়ার সন্ধান পান নি। নিরাশ হয়ে হযরত আম্মাজানের কাছে এসে দোয়ার আবেদন করলেন। তিনি কাগজে একটি দোয়া লিখে দিলেন আর বললেন, "আমিও দোয়া করবো, আপনিও এ দোয়া পড়তে পড়তে ঘোড়াকে খুঁজতে থাকুন। ইন্‌শাআল্লাহ্, পেয়ে যাবেন।"

মিয়া আল্লাহ্‌রাখ্‌খা দোয়া পড়ছিলেন আর কাগজের লেখা শুকানোর জন্য ফুঁ দিতে দিতে লঙ্গরখানা থেকে একটু দূরে গিয়েছেন এমন সময় দেখলেন তার ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে সামনে চলে এসেছে। এভাবে হযরত আম্মাজানের দোয়ার ফলে ঘোড়া পাওয়া যায়।

প্রিয় সোনামণিরা! সব ঘটনা পড়ে ও যা কিছু আমরা হযরত আম্মাজান সম্পর্কে হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের নিকট থেকে শুনেছি সেগুলোকে সামনে রেখে আমরা হযরত আম্মাজানের জীবন সম্পর্কে নি:সন্দেহে বলতে পারি তিনি অত্যন্ত দানশীল ও পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধরনের চাঁদা প্রদানে শামিল থাকতেন। পাঁচ বেলার নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করতেন। এমনকি তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফলও আদায় করতেন। তাঁর হৃদয়ে সর্বদা খোদার ভয় বিরাজ করতো। তিনি যেমন একজন সেবাপরায়ণ ও বিশ্বস্ত স্ত্রী ছিলেন তেমনি সন্তানদের জন্যও এক অতুলনীয় 'মা' ছিলেন। তিনি সাংসারিক ও অন্যান্য কাজ অতি উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ধৈর্য ও সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করতেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের অধিকারী ও বড় মনের মানুষ ছিলেন। কেউ যদি তাঁকে কিছু বলতো, কোন কষ্ট দিত তাহলে তিনি কোন অভিযোগ করতেন না, এমনকি তিনি তা প্রকাশই করতেন না। কষ্টদাতা নিজেই বিরত হতো ও লজ্জা পেত। তিনি নিজে অভিযোগ, পরনিন্দা, পরচর্চা করতেন না, আর তা শুনাও পছন্দ করতেন না। তাঁর হৃদয়ে কারো বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা ছিল না, বরং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল।

তাঁর হৃদয় খোদার ভালোবাসা, তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসা, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভালোবাসা, তাঁর (খোদার) কিতাবের ভালোবাসা ও তাঁর বান্দাদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকের উপকার করা, দু:খকে ভাগ করে নেয়া, প্রত্যেক খুশির কাজে আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল এবং এর প্রতি ঝোঁকও ছিল। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই পছন্দ করতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। সুগন্ধি হযরত আম্মাজানের খুবই পছন্দনীয় ছিল। হুযূরও (আ.) আম্মাজানের জন্য বিশেষভাবে আতর ও চামেলীর (এক ধরনের ফুল) তেল আনাতেন। পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে সাথে তিনি নিজের ঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। তাঁর ঘর সবসময়ই আগরবাতি, হারমাল, লোবান প্রভৃতির ধোঁয়ার খুশবুতে পরিপূর্ণ থাকতো। খাবারের মাঝে এক প্রকার শুষ্ক মেথী ঢেলে দিতেন যাতে খাবার সুগন্ধি হয়।

তাঁর নানার বাড়ির দিক থেকে এক আত্মীয় ছিলেন। তিনি সম্পর্কে তাঁর ভাই হন যিনি গয়েরআহমদী ছিলেন। একবার শীতের সময় তিনি কাদিয়ানে আসেন। এমনিতে তো কাদিয়ান গ্রাম এবং কাদিয়ানবাসী দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। অপরদিকে নিজের আপা হযরত নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা তাঁর উপর কি প্রভাব বিস্তার করেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন–

"আপার এটা রীতি ছিল, তিনি সকাল সকাল উঠে আমার কাছে আসতেন। এসে দরজার কড়া নাড়াতে নাড়াতে ভিতরে প্রবেশ করতেন। 'আসসালামু আলাইকুম' বলে কথা শুরু করে দিতেন। আমি লেপ মুড়িয়ে খাটের উপর বসতাম। তিনি পায়চারী করতেন আর কথা বলে যেতেন। তাঁর শব্দে একটা জোরালো ভাব থাকতো। দৃষ্টি সক্রিয় থাকতো। তাঁর হাত, পা শক্তিশালী ও শরীর সুঠাম ছিল। তিনি খুবই চঞ্চল ছিলেন। তিনি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সব কথার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতেন। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রতিটি বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলতেন এবং নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। পান খাওয়ার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি ছিল। কথা বলে যেতেন আর পান খেতে থাকতেন। দিল্লীবাসীদের বিশেষ পোশাক হচ্ছে, জামা ও আঁটসাঁট পায়জামা। জামার উপর সুয়েটার পরে তাতে কাশ্মিরী শাল এমনভাবে পরতেন যে, মাথা ঢেকে যেত আর মাফলারও মনে হতো। শেষে কোট পরে সবগুলোকে একত্র করে নিতেন। এক হাতে তসবীহ্ ও অন্য হাতে হাতমোজা থাকতো। ভোরে নামাযের পর ঘর থেকে বের হতেন। প্রথমে আত্মীয়-স্বজন, পরে বন্ধু-বান্ধব ও জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের ঘরে যেতেন। তাদের কুশলাদি জানতেন, রোগীদের সেবা যত্ন করতেন। কখনো শিশুদের চিকিৎসা করতেন, কখনো বয়স্কদের কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন। কাউকে ঔষধ বলে দিতেন, কাউকে ঔষধ নিজে তৈরী করে দিতেন। আর এ চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর খুবই ভালো দক্ষতা ছিল।

দশ/এগারটা পর্যন্ত দেখাশুনার পর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। দপুরের খাবারের পর তিনি বিশ্রাম নিতেন। আসরের নামায পর্যন্ত ঘরে বউ ও মেয়েদের সাথে সময় কাটাতেন। বিকালে পুনরায় ভ্রমণের জন্য বের হতেন। প্রতিদিন তিনি এ রুটীন অনুসরণ করতেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ৫৪ বছর ছিল। কিন্তু তিনি মনের দিক থেকে যুবতী ছিলেন। তিনি সংকল্পপূরণ, কর্মসম্পাদন উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত উদ্যম রাখতেন। একজন প্রতাপান্বিত কমান্ডারের মত কাদিয়ানের জনবসতির উপর তাঁর প্রভাব ছিল। যেভাবে তিনি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন, ঠিক সেভাবে নিজের প্রতাপ ও প্রভাব দিয়েও তিনি কাজ করতেন। ঐ কাজের মধ্যে তাঁর আত্মতৃপ্তি ছিল। আর তিনি এগুলোকে নিজের কর্ম বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে যার খেদমত করা সম্ভব হতো তার খেদমত করতেন। সান্ত্বনা দিতেন ও সমবেদনা জানাতেন।"

মোট কথা, তিনি অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। তিনি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম জীবনাদর্শ, সুন্নত ও হাদীসের উপর পূর্ণ আমলকারী ছিলেন। তাঁর এ অতি উচ্চ নমুনা জামাত প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁর কাছ থেকে জামাত ভালোবাসা আর ভালোবাসাই পেয়েছে। তিনি জামাতের জন্য সত্যিকার মায়ের চেয়েও বেশি ছিলেন।

হযরত আম্মাজানের মৃত্যু

যখন হযরত আম্মাজানের মৃত্যুর সময় সন্নিকটে আসলো, তখন জামাতের সকল সদস্য এমনভাবে অস্থির ও বিগলিত চিত্তে খোদার দরবারে দোয়া করতে লাগলো, যেন আপন মায়ের জন্য দোয়া করছে। কিন্তু খোদার তকদীর অন্য ছিল, তাঁর ডাক এসে পৌঁছলো। ২৫ দিন অসুস্থ থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৫২ সালে তিনি তাঁর মওলার নিকট গিয়ে মিলিত হন। তিনি কাদিয়ান থেকেই মোটা কাপড়ের একটি থান ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর একটি জামা সাথে নিয়ে এসেছিলেন। আর বলতেন, "এটা আমি নিজের কাফনের জন্য রেখেছি।" তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রথমে তাঁকে ঐ বরকতমন্ডিত জামা পরানো হয়, পরে কাফনের কাপড় পরিয়ে বেহেশতি মাকবেরা রাবওয়াতে দাফন করা হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

> "এ বছর আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। আর তা হলো হযরত আম্মাজানের মৃত্যুবরণ। তাঁর সত্তা আমাদের ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী শিকল ছিল। তিনি আমাদের ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর মধ্যে এক জীবন্ত মাধ্যম ছিলেন। যা তাঁর মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে গেল।"

হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা আম্মাজানের মৃত্যুর পর এক প্রবন্ধে লিখেন-

> "আম্মাজান খুবই মমতাময়ী মা ছিলেন শুধুমাত্র এ কারণে নয়, আবার তিনি আজ এ পৃথিবীতে নেই বিধায় তাঁর গুণকীর্তন করা উচিত সে জন্যও নয়, আর এ জন্যও নয় তাঁর প্রতি আমার খুবই ভালোবাসা রয়েছে। বরং সত্য, প্রকৃত সত্য এটাই, আল্লাহ তা'লা হযরত আম্মাজানকে এমন এক যোগ্য সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাঁকে নিজের মামুরের (প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ) জন্য বেছে নিয়েছেন। যাঁকে বিশেষ নেয়ামত (পুরস্কার) আখ্যা দিয়ে নিজের মা'মুরকে দান করেছেন।"

পরিশেষে তিনি লিখেন-

> "আমার 'মা' এক অতুলনীয় মা ছিলেন। তিনি সব আহমদীর 'মা' ছিলেন। তিনি তো আজ নিশ্চুপ আছেন, কিন্তু খোদা তা'লা যতদিন তাঁর সাথে আমাদের না মিলাবেন ততদিন তাঁর পৃথক হওয়ার ব্যাথাকে সমভাবে অনুভব করতে থাকবো।"

"সারা জীবন তিনি আমাদের ব্যাকুল রাখবেন পথ প্রদর্শক হয়ে,
তিনি আসবেন না কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমরা যাব বয়ে।"

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

SEERAT HAZRAT AMMAN JAN

The book 'SEERAT HAZRAT AMMAN JAN' is the life history of Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba[ra], wife of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani the Promised Messiah[as]. She was known as 'AMMAN JAN'. Her life sketch has been narrated in brief in this book. Original text of the book is written by Sahibzadi Amatus Shakur Sahiba in Urdu. Maulana Shah Muhammad Nurul Amin translated this book in Bangla.

© Islam International Publication Ltd. U.K.

ISBN 978-984-991-326-9

9789849913269